সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দরবারি কানাড়া

বাংলা ছোটো গল্পের আসরে—সুচিত্রা ভট্টাচার্যের এক সাড়া জাগানো সৃষ্টি 'দরবারি কানাড়া'। ছোট ছোট গল্পের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হওয়ায় গল্পগুলির নির্বাচনে স্বভাবতই বৈচিত্র্য এসেছে।

কোন লেখা যখন সমকালীন পাঠক পাঠিকার হৃদয়কে আলোড়িত করে, তখনই লেখা হয়ে ওঠে জনপ্রিয়। লেখককে দেয় শ্রেষ্ঠত্বের ছোঁয়া।

ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা বিভিন্ন অপ্রকাশিত গল্প এই সংকলনে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মেজাজের প্রতিফলন লেখা গুলিতে ফুটে উঠেছে।

বিভিন্ন গল্পের চরিত্রগুলো যেন পাঠকের বহু দিনের চেনা, চরিত্রগুলো যেন পাঠকের পাশের বাড়ির। তাই বিভিন্ন বাঁক এসে পড়েছে এই বইয়ের নানা গল্পে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর দক্ষ লেখনীর সাহায্যে গল্পগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। অনেকবার পড়বার পরও লেখাগুলি মনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে থাকবে। এখানেই এই গল্পগুলির সার্থকতা।

দরবারি কানাড়া

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

দরবারি কানাড়া

ধ্রুপদ

DARBARI KANADA
Suchitra Bhattcharjaya
Bengali Novel
Rs.80.00

মলাটের ছবি ঃ রঞ্জন দত্ত

প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২৮ জানুয়ারি, ২০১১ ❑ প্রকাশক ঃ ভারতী দত্ত 'পুষ্প' ৫৭ 'এ' ব্লক বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০৫৫ ❑ অক্ষর বিন্যাসে ঃ শৈব্যা বুকস্ এন্ড লেজার, ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ ❑ মুদ্রণে ঃ অজয় দাস, নিউ অন্নপূর্ণা প্রেস, ১৯ সি, এইচ/৪, গোয়াবাগান স্ট্রিট কলকাতা-৬। প্রধান পরিবেশক ঃ ঘোষ লাইব্রেরী, ১৩, ব্লক 'বি' বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০৫৫।

[চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সাতান্ন 'এ' ব্লক বাঙুর এভিন্যু
ফ্ল্যাট নং ছয় কলকাতা-সাতলক্ষ পঞ্চান্ন]

৮০.০০ টাকা

উৎসর্গ

প্রিয়,
ইভাদি ও জামাইবাবুকে

দরবারি কানাড়া ❐ ১১

একটা শুধু রং নাম্বার ❐ ২০

বাড়ি ❐ ৩৪

দূরের মানুষ ❐ ৪২

চোরকাঁটা ❐ ৫৩

অহং ❐ ৬৭

ভালবাসা অথবা... ❐ ৭৫

নখ ❐ ৮৩

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স ❐ ৯১

হিসেব মেলে না ❐ ১০৩

অচিন মায়া ❐ ১২০

জাহাজবাড়ির পরী ❐ ১৩১

আমাদের প্রকাশিত
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের আরও বই

- শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম
- শ্রেষ্ঠ গল্প ২য়
- শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য়
- প্রেমের গল্প
- একদিন হঠাৎ
- তিন কন্যা
- মেঘ পাহাড়
- সম্পর্ক
- আবর্ত
- আমি রাইকিশোরী

দরবারি কানাড়া

বাজারের থলি রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে এক সেকেন্ডও তর সইল না সুখেন্দুর। উদগ্রীব মুখে কবিতাকে জিজ্ঞেস করল, ফোন এসেছিল?

কবিতা কেটলিতে চা ছাড়ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—কার?

—আশ্চর্য, আকাশ থেকে পড়লে যেন! রিমি ফোন করেনি এখনও?

—আহা, আসবে তো বলেইছে। কাল রাত্তিরে তো কথা হল।

—তবু...

—তবুর কী আছে? কতবার ফোন করবে?

সুখেন্দু ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারল না। যত বারই কথা হোক, সকালে একবার মেয়ের ফোন তো সে আশা করতেই পারে। নির্ঘাত রিমি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এমনিতেই দেরিতে বিছানা ছাড়ার অভ্যাস, তার ওপর কাল যা হয়রানি গেছে বেচারার। সাত দিনের হনিমুন সেরে কোথায় সক্কাল সক্কাল ফিরে আসবে তা নয়, হাওড়াতেই পৌঁছল প্রায় বিকেলবেলায়। কুয়াশায় ট্রেন আট ঘণ্টা লেট। কামরায় নাকি জল ছিল না, ভালমতো খাবার জোটেনি, বাথরুম নোংরা—খুব নাজেহাল হয়েছে। প্রাণে যতই হুটোপুটির শখ থাকুক, রিমি মোটেই এসব ধকল নিতে পারে না। সুখেন্দু জানে।

কবিতা চায়ের কাপ এনে রেখেছে টেবিলে। ভ্রূভঙ্গি করে বলল—

ভ্যাবলারামের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমার মঙ্গলগ্রহের পোশাকটি এ বার ছাড়ো।

সুখেন্দুর প্রাতঃভ্রমণের সাজসজ্জা নিয়ে বিদ্রূপ করাটা কবিতার স্বভাব। ব্যঙ্গটা গায়ে না মেখে সোফার হাতলে বসে জগিং শু খুললো সুখেন্দু। আনমনে বলল—আজও কিন্তু ভাল ঠাণ্ডা আছে।

—ছাই আছে। ওটা তোমার বাতিক। মাংকি-ক্যাপ, মাফলার, ফুলস্লিভ সোয়েটার, কিছুই তো চড়াতে বাকি রাখোনি। তার পরেও যে কী করে শীত টের পাও! কবিতা মুচকি হাসল, মেয়ে-জামাইকে দেখে শেখো। ওরা কেমন দিব্যি গ্যাংটক ঘুরে এল।

সুখেন্দুর আঁতে লেগেছে কথাটা। গোমড়া মুখে বলল—ওটা মোটেই কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। মাঘ মাসে কেউ গ্যাংটক যায়? সৌমিক মোটেই জায়গা ভাল চুজ করেনি।

—তোমার মেয়ে কিন্তু লাফাতে লাফাতেই গেল।

—উঁহু। আপত্তি করার মানে হয় না বলে সে সোনামুখ করে গেছে। বাঁদুরে টুপিখানা খুলে ডাইনিং টেবিলে রাখল সুখেন্দু। চেয়ার টেনে বসেছে। কাপে চুমুক দিয়ে বলল—যদি পছন্দ করতে দিত, আমার রিমি সমুদ্রের ধারে যেতে চাইত। পুরী, কিংবা গোপালপুর। আই বেট।

—ফের সেই এঁড়ে তর্ক! কবিতা হাল্কা ঝেঁঝে উঠল—কোথায় যাবে ওরা আলোচনা করেনি বুঝি? আমি তো যত দূর জানি, সৌমিক রিমিকে জিজ্ঞেস করেই...

সুখেন্দু কাঁধ ঝাঁকাল। অবুঝকে কী বলবে? যে মেয়ে কলকাতার শীতেই কাবু হয়ে পড়ে, মাত্র ক'বছর আগেই সুখেন্দুর বড়দিনে নৈনিতাল যাওয়ার প্ল্যানটা ভেস্তে দিল, সে কিনা স্বেচ্ছায় পাহাড়ে যেতে সম্মত হয়েছে? সুখেন্দুকে এ কথা মানতে হবে? গ্যাংটকে গিয়ে বিপদও তো বাধিয়েছিল প্রায়। জামাইয়ের সঙ্গে ফোনে বাতচিতের সময়ে সুখেন্দু স্পষ্ট শুনেছে, হোটেলের ঘরে রিমি ঘং-ঘং কাশছিল। ছেলেটি অবশ্য মহা ধুরন্ধর, জিজ্ঞেস করতেই বলে কিনা গলায় স্যান্ডউইচ আটকেছে! অগত্যা রিমিকেও পরে একই সুর গাইতে হল। দুনিয়ার কোন বউই বা নতুন বরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে চায়?

চা শেষ। ভেতরে ভেতরে এক মৃদু অস্থিরতা। সেই যে দ্বিরাগমনে এসে একটা রাত কাটিয়ে গেল মেয়ে, তারপর আট-আটটা দিন চলে গেছে, রিমিও নিশ্চয়ই এ বাড়ি আসার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। খবরের কাগজখানা তুলেও রেখে দিলো সুখেন্দু। হাত উস্‌খুস্ করছে। রিমি কখন আসবে জানতে চাওয়া নিশ্চয়ই দোষের নয়?

মেয়ের মোবাইল নম্বরটা টিপতেই ওপারে হেঁড়ে গলা। সৌমিক।

একটু হতাশ হল কি সুখেন্দু? স্বরে অবশ্য প্রসন্নতা ঝরিয়েই বলল—কী ব্যাপার, ঘুমটুম সব ভাঙল?

—অনেকক্ষণ। আমার তো স্নানও কমপ্লিট।

—বাহ্, বাহ্। তা রিমি কোথায়?

—কিচেনে। মা-র সঙ্গে লুচি ভাজছে। ফোনটা দেব? কথা বলবেন?

বাচনভঙ্গিটি যেন কেমন কেমন না? কর্তালি কর্তালি ভাব? যেন সৌমিকের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরই নির্ভর করছে মেয়ের সঙ্গে সুখেন্দু বাক্যালাপ করতে পারবে কিনা?

সুখেন্দু গলা ঝেড়ে বলল—না, না, থাক। রিমি তো সকালেই এখানে....

—হ্যাঁ তো। আমরা তো একটু পরেই বেরোচ্ছি। পারমিতাকে ড্রপ করে দিয়ে আমি অফিস যাব।

মেয়ের নামটা খট্ করে কানে বাজল সুখেন্দুর। রিমিই যে পারমিতা, স্মরণে থাকে না সব সময়। স্বর সহজ রেখেই সুখেন্দু বলল—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

কবিতা কাপ নিয়ে উঠে গিয়েছিল। রান্নাঘর থেকেই শুনতে পেয়েছে শ্বশুর-জামাইয়ের আলাপচারিতা। সুখেন্দু ফোন রাখতেই তার গলা উড়ে এল—আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ তো! ফোনটা না করলে চলছিল না?

গিন্নির উষ্মাকে আমল না দিয়ে সুখেন্দু বলল—তোমার মেয়ের বোধ হয় আসতে দেরি হবে। শ্বশুরবাড়িতে এখন লুচি ভাজার পর্ব চলছে।

—বা রে, একটুআধটু ঘরের কাজ করবে না? এ তো বাপের বাড়ি নয়, যে সারাক্ষণ ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে রইলাম, আর হুকুম ঝেড়ে যাচ্ছি...। তা ছাড়া কাল বাদে পরশু থেকে তো ওর স্কুল...

—তখনও কি হেঁশেলে ঢোকা থেকে ছাড়ান মিলবে।

—ফুরসত পেলে ঢুকবে। নবাবনন্দিনী তো নয়, মান তো খোয়া যাবে না। কবিতা রান্নাঘরের দরজায় এল—তা কাজের কথাটা হয়েছে?

—কী?

—সৌমিক কখন আসবে জিজ্ঞেস করেছ?

—না তো।

—আশ্চর্য লোক! দ্বিরাগমনের পর জামাইয়ের এই প্রথম নেমন্তন্ন, মানুষ তো ভদ্রতা করেও একবার বলে। কবিতাকে যেন সামান্য উদ্বিগ্ন দেখালো—ছেলেটা ছুটির পর আজই জয়েন করেছে, কখন ছাড়া পায়, না পায়...

যত্তোসব আদিখ্যেতা! সুখেন্দু তেরচা চোখে বলল—আসছে তো রিমিকে নামাতে। তখন জেনে নিয়ো।

—ওমা, তাই নাকি? কবিতার দৃষ্টি জ্বলজ্বল—দ্যাখো, দ্যাখো, একেই বলে দায়িত্বজ্ঞান। যেটা তোমার বিন্দুমাত্র ছিল না। মনে আছে, দ্বিরাগমনের পর আমায় একাই বাপের বাড়ি যেতে হয়েছিল?

কী বউ, বাপ্‌স! উনত্রিশ বছর আগের ঘটনা এখনও সযত্নে পুষে রেখেছে! এবং তাই নিয়ে তুলনা দিচ্ছে কিনা জামাইয়ের সঙ্গে? এ তো রীতিমতো ইনসাল্ট!

সুখেন্দু ক্ষুণ্ণমুখে বলল—তোমার বাপের বাড়ি চন্দননগর, আমার অফিস ডালহৌসি। তোমাকে পৌঁছে অফিসটা যাব কী করে? আর এ বাড়ি তো সৌমিকের যাতায়াতের রুটে পড়ে।

—যুক্তি সাজিও না। এতে নেচারটা বোঝা যায়।...যাক গে যাক, বাজার কী এল?

—ভেটকি, কই আর মাটন।

—কইমাছ?

—অফকোর্স। রিমিটা তেল-কই ভীষণ ভালবাসে।

—আর জামাই? রাত্তিরবেলা ওই কাঁটামাছ খাবে? এমনিতেই ছেলেরা আজকাল মাছটাছ তেমন পছন্দ করে না...

খাবে না তা হলে। বসে বসে রিমির খ্যাটন দেখবে; বলতে গিয়েও কথাটা গিলে নিল সুখেন্দু। হঠাৎই এক চোরা পুলকে প্রাণ থইথই। সৌমিক ছেলেটা তাকে বড্ড যন্ত্রণা দিচ্ছে। মেয়েটাকে তো কেড়ে নিলই, গিন্নি পর্যন্ত তাকে নিয়ে আহ্লাদে ডগমগ। নাহ্‌ একটু-আধটু জাঁতা তো বাবাজীবনকে পেতেই হয়।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা মধুচন্দ্রিমার ছবিগুলো দেখাচ্ছিল রিমি। এখনও সিডি-ফিডি করা হয়নি, ছোট্ট মনিটারেই ফুটে উঠছে একের পর এক। নানান ভঙ্গিমায় অজস্র রিমি। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পিছনে রেখে জিন্‌স-জ্যাকেট পরা রিমি, প্রশস্ত চত্বরটায় বাহারি টুপিতে রিমি, হোটেলের বারান্দায় আষ্টেপৃষ্ঠে শাল মোড়া রিমি, রুমটেক মনেস্ট্রির সামনে গায়ে সৌমিকের কোট চাপিয়ে রিমি...। একা সৌমিকও আছে কয়েকটা। যুগল ফোটোগ্রাফেরও কমতি নেই। কখনও রিমির হাত ধরে সৌমিক, কখনও সে বেড় দিয়ে আছে রিমির কাঁধ, কোথাও সৌমিকের বুকে রিমির মাথা, কোথাও বা রিমির কোলে মাথা রেখে সৌমিক...। হোটেলের শয্যায় অটো ক্লিকে তোলা আরও বুঝি ঘনিষ্ঠ ছবি ছিল কিছু, পটাপট বোতাম টিপে রিমি সেগুলোকে পার করে দিল। এবার ছাংগু লেকের বরফ

দেখাচ্ছে। সেখানেও বরফের গোলা হাতে রিমি, সানগ্লাস চোখে সৌমিক-রিমি...

দেখতে মন্দ লাগছিল না সুখেন্দুর। এক একটা ছবিতে রিমি যে কী মিষ্টি, আহা। মুখখানা অল্প ফোলা ফোলা, গালে লালচে আভা, বড় বড় চোখ দুটো যেন ঝকমক ঝকমক। আগে সেভাবে খেয়াল করা হয়নি, মেয়েরা বিয়ের পর ভারি সুন্দর হয়ে যায় তো! মাথাটা কেমন ঝিমঝিমও করছিল সুখেন্দুর। হঠাৎ হঠাৎ। খুশি যেন উপচে পড়ছে রিমির। মাস ছ'সাত আগেও তো ছেলেটার অস্তিত্বই ছিল না রিমির জীবনে, তার সান্নিধ্যে রিমি কি বড্ড বেশি গদগদ নয়? একটা অচেনা ছেলে দুম্ করে এত আপন হয়ে গেল? কী আজব রসায়ন রে ভাই!

পলকের জন্য সুখেন্দুর মনে হল, রিমিটার বিয়ে না দিলেই ভাল হত। পরক্ষণে কষে ধমকাল নিজেকে। এ কেমন ধারার চিন্তা? ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিল...বরের সঙ্গে ভাবভালবাসা না হলে কি সুখেন্দু স্বস্তি পেত? তবু যে কেন বেভুল হয়ে যায় বার বার!

মুখে একটা হাসি টেনে সুখেন্দু বলল, আর কোথায় কোথায় গেলি? ছাংগু, রুমটেক ছাড়া?

রিমি ঠোঁট উল্টে বলল—দূর, তোমার জামাই যা কুঁড়ের বাদশা! দু'দিন বেরিয়েই তার এনার্জি খতম। বলে, ঢের হয়েছে, এবার হোটেলের জানলা দিয়ে শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা দ্যাখো।

—সে কী রে? তা হলে তো বেড়ানোর আনন্দটাই মাটি।

রিমির যেন তাতে এতোটুকু আফশোস নেই। উল্টে ফিকফিক হাসছে—না না, অত ঠাণ্ডায় আর কোথায় ঘুরব বলো?

—তা ঠাণ্ডার দেশে গেলি কেন?

জবাব দেওয়ার আগেই রিমির মোবাইলে ঝংকার। মুহূর্তে সেলফোন কানে চেপে মেয়ে ফুড়ুৎ। মাত্র ঘণ্টা তিনেক হল এসেছে, এর মধ্যে চতুর্থ বার শ্যামের বাঁশি বাজল। এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? সৌমিক ছোকরার অফিসে কি কাজকর্ম থাকে না? কোম্পানি কি আজকাল ইঞ্জিনিয়ারদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেয়?

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কবিতা এসেছে ঘরে। তাড়া লাগিয়ে বলল—এখনও বসে আছ? যাও স্নানটা সেরে এসো।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি। সুখেন্দু ভুরু বেঁকাল—ওদের এত কী কথা চলছে বলো তো?

—তা জেনে তোমার কী মোক্ষ লাভ হবে?

—বিয়ে তো আমরাও করেছিলাম। আমাদের তো এত ফোনাফুনি হত না!

—তখন মোবাইল ছিল কী?

—তা বটে। যন্ত্রটাই একটা আপদ। মেয়ের জন্য আজ অফিস ডুব মারলাম, অথচ তার সঙ্গে দু'দণ্ড সুস্থির হয়ে কথা বলার জো নেই!

বেজার মুখে বাথরুমে ঢুকে গেল সুখেন্দু। বেরিয়ে দেখল, খাবার টেবিলে রিমি। বাবার অপেক্ষায় বসে। চটপট চুল আঁচড়ে সুখেন্দুও হাজির। বলল—নে, শুরু কর।

হাঁসের মতো গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে রিমি পর্যবেক্ষণ করছে রান্নাবান্না। চোখ নাচিয়ে বলল—ওয়াও, কত কী হয়েছে!

—সবই তোর ফেভারিট। সুখেন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—সর্ষে-ভেটকি, তেল-কই, পাঁঠার মাংস...

—ইস্ এত কেন রাঁধতে গেলে মা? হেভি খাটুনি গেল তো?

—আর আমার পরিশ্রমটা বুঝি ফ্যালনা? বেছে বেছে জিনিসগুলো যে আনলাম?

—বাজার করা তো তোমার নেশা বাবা। বলেই মিটিমিটি হাসছে রিমি, জানো তো, একটা মজা হয়েছে। আজই সকালে বাবা বলছিলেন...

দুটো বাবার গোল পাকিয়ে গেল। বুঝেই বোধ হয় রিমি শুধরে নিয়েছে—মানে সৌমিকের বাবা। বলছিলেন, সৌমিক নাকি একেবারেই ন্যাদোশ। বাজারের ব জানে না। ঝিঙে ঢ্যাড়োশের তফাত পর্যন্ত চেনে না। হি হি, রামকেবলুশ। তুমি ওকে একটু ট্রেনিং দিয়ো তো।

সৌমিকের এ হেন অপদার্থতার এত স্ফূর্তি জাগার কী আছে সুখেন্দুর মগজে ঢুকল না। তবে একটা ক্ষেত্রে অন্তত মেয়ে তাকে বেশি মূল্য দিচ্ছে ভেবে আত্মপ্রসাদ জাগল যেন। প্রফুল্ল চিত্তে গল্প চালাচ্ছে টুকটাক। ট্রেনের দুর্গতি, হোটেলের হালচাল, ছাংগুর হাড় হিম করা শীত...

আবার রিমির মোবাইল ঝনঝন। খপ্ করে ফোন তুলেছে মেয়ে। সুখেন্দু বেশ বিরক্ত বোধ করল। সময়-অসময় জ্ঞান নেই ছেলেটার? সবে রিমি কই মাছ ধরেছে, এখন যদি গলায় কাঁটা লেগে যায়?

চাপাস্বরে কী বকম বকম হলো কে জানে, ফোন ছেড়ে রিমি লাজুক হেসে বলল—ওফ্, বড্ড জ্বালাচ্ছে।

—আহা ফাঁক পেলে একটু বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করবে না? কবিতা রঙ্গ করল। সঙ্গে পুটুস হল—সবাই কি আর তোর বাবার মতো রসকষহীন?

আবার সেই তুলনা! সুখেন্দুর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। আহার সেরে মেয়েকে বলল—খেয়ে উঠে ঘরে আয়। বাপ-বেটিতে একটু আড্ডা মারি।

এক্ষুনি? রিমির কণ্ঠে ক্ষীণ আপত্তির সুর, ভাবছিলাম একটু গড়িয়ে নেব।

—সে কী? তুই আবার কবে থেকে দুপুরে ঘুমোস?

—স্লাইট অভ্যেস মতো হয়ে গেছে। সৌমিক তো অনেক রাত অবধি জাগে, তাই আমাকেও...। পরশু থেকে তো স্কুলই শুরু হয়ে যাবে, এক দু'দিন একটু সুখ করে নিই।

—অ।

ঈষৎ আহত মুখে উঠে গেল সুখেন্দু। মেয়ে আসার উত্তেজনায় খবরের কাগজটা পড়া হয়নি, বিছানায় আধশোওয়া হয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে কবিতা। চোখ পাকিয়ে বলল—তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আর কবে হবে গো? বোঝো না, কেন মেয়ে দুপুরে ঘুমোচ্ছে?

—আমার বোঝার দরকার নেই।

—প্যাঁচার মতো মুখ কোরো না তো। কবিতা ধপ্ করে খাটে বসেছে। রহস্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে বলল—যাই বলো, আমাদের ছেলে সিলেকশান কিন্তু পারফেক্ট হয়েছে।

—কী করে জানলে?

—তোমার মেয়ের কাছ থেকে। বলছিল, ফ্যামিলিটা খুব ভাল, শ্বশুর-শাশুড়ি ভীষণ অ্যাফেক্শনেট। রিমিকে তো ওরা বলে দিয়েছে, তুমি বউ নও বাড়ির মেয়ে। আপনি-আজ্ঞের দরকার নেই, আমাদের তুমি তুমি করবে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একদম ওপেন। রিমির কোনও ড্রেসেই আপত্তি নেই। শুধু আত্মীয়স্বজন এলে শাড়ি কিংবা সালোয়ার-কামিজ...অন্তত প্রথম বছরটা...। আর সৌমিকের সঙ্গে তো রিমির দারুণ মিলমিশ হয়েছে।

—সে তো ওদের ছবি দেখেই মালুম হয়।

—তুৎ, ছবিতে আর কতটুকু ধরা পড়ে! কায়দা করে বাকিটা জেনে নিলাম।

—জানার আর আছেটা কী?

—নেই? ওদের দাম্পত্য সম্পর্কটা কেমন হল...মানে কনজুগাল লাইফ...। কবিতা মটাস্ করে চোখ টিপলো—আভাসে ইঙ্গিতে যা বুঝলাম, সব ঠিকঠাকই চলছে। রিমি হ্যাপি।

সহসা সুখেন্দুর শিরদাঁড়ায় বৈদ্যুতিক ঝটকা। একটা আদিম দৃশ্য ঝলসে উঠেছে চোখে। তার আদরের রিমি; যে কিনা এককালে বাবার গলা না জড়িয়ে ঘুমোতে পারত না, সে আজ...।

কী অস্বস্তিকর চিন্তা! জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল সুখেন্দু। খাটের ধারে গ্যাংটক থেকে আনা রিমির উপহারগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে। বড় এলাচের প্যাকেট, দেওয়ালে ঝোলানোর কাঠের ড্রাগন, শুভেন্দুর জন্য একটা উইন্ডচিটার, একখানা দেখনবাহার কুকরি...

ওই কুকরিতেই কেন যে চোখ গেঁথে গেল সুখেন্দুর!

রাতে জামাইয়ের জন্য রান্না হয়েছে আর এক প্রস্থ। মাছের চপ, পোলাও, মুচমুচে পরোটা। সুখেন্দুকে ঠেলা মেরে মেরে কবিতা রাবড়িও আনাল এক ভাঁড়। শেষপাতে মিষ্টি খেতে ভালবাসে ছেলেটা, বলেছে রিমি।

তা আনাজপাতি না চিনুক, ভোজনে সৌমিক রীতিমতো দড়। কই মাছ না খাওয়ার ঘাটতিটুকু সে মাংসতে পুষিয়ে নিল। রাবড়ির প্লেটও চেটেপুটে সাফ।

ভরপেট সাঁটিয়ে বসেছে সোফায়। আয়েশ করে মউরি চিবোচ্ছে। হঠাৎই ঘড়ি দেখে বলল, এ বার তা হলে আমরা রওনা দিই?

সত্যি, আর আটকানোর কোনও মানে হয় না। পৌনে দশটা বাজে, ছেলেমেয়ে দুটো সেই বেহালা ফিরবে...। তা ছাড়া সৌমিকের সঙ্গে তেমন জমছেও না সুখেন্দুর। রিমিকে সতেরো বার ফোন করে বাক্যের ফুলঝুরি ছোটায়, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এসে যেন মুখে কুলুপ। নিজের সম্পর্কে তো কিছু বলতে চায়ই না, অফিস-টফিসের আলোচনাতেও অনীহা। কাঁহাতক একা বকে যায় সুখেন্দু?

হঠাৎ সুখেন্দুর একটু রসিকতার বাসনা জাগল। হাল্কাভাবে বলল—রিমি আজ থেকে যাক না।

সুখেন্দু ভেবেছিল প্রস্তাবটা মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে যাবে সৌমিকের। যাহ্ বাবা, কোনও হেলদোলই নেই। দিব্যি মাথা দুলিয়ে বলে দিল—বেশ তো, থাকুক। পরশু নয় এখান থেকেই সোজা স্কুলে যাবে।

কিন্তু কী কাণ্ড, রিমির মুখে মেঘ। দু'হাত নেড়ে বলে উঠল—না গো বাবা, আজ আমি যাই। কাল রান্নার লোকটা ছুটি নিয়েছে, মাকে সব একা হাতে করতে হবে...সকালে সৌমিকের অফিস বেরনো আছে...

একটা কারণও তেমন জোরদার ঠেকল না সুখেন্দুর। পুরো দু'সপ্তাহও

পেরোয়নি রিমি শ্বশুরবাড়ি গেছে, তার মধ্যে আটটা দিন তো হানিমুনেই কাটল, এখনই রিমি বিহনে একদিনে চোখে অন্ধকার দেখবে শাশুড়ি? রিমি যখন ছিল না, সৌমিকও কি অফিস যায়নি? কই, নিজের বাবা-মা-র কথা তো এভাবে ভাবছে না মেয়ে!

বাবার পাংশু মুখখানা এতক্ষণে বুঝি নজরে পড়েছে রিমির। সুখেন্দুর কাছে এসে তরল গলায় বলল—আমার এ বাড়িতে থাকাটা কোনও ব্যাপার নাকি বাবা? যখন খুশি চলে আসতে পারি। হয়তো স্কুল থেকে দুম্ করে এসে গেলাম। কিংবা ছুটিছাটায় পুরো দিনটাই এখানে স্পেন্ড করলাম। একা...কিংবা আমরা দু'জনে...

সৌমিকও তালে তাল দিল—অবশ্যই। সে তো করাই যায়।

—শুনলে? শুনে নিলে? রিমি সুখেন্দুর চুল ঘেঁটে দিল—আজ তা হলে আসি?

নাচতে নাচতে, উড়তে উড়তে, বরের বাহনে চেপে গেল রিমি।

সুখেন্দু স্থির দাঁড়িয়ে। পাশে কবিতা।

মিয়োনো গলায় কবিতা বলল—আর অত মেয়ে মেয়ে'কোরো না। মানার চেষ্টা করো, মেয়ে এখন পর হয়ে গেছে।

সুখেন্দু চুপ। বিয়ের পরদিন শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে মেয়েটা খুব কান্নাকাটি করেছিল। সুখেন্দুর বুকটা বিলকুল ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল তখন। আজ এই হাসতে হাসতে চলে যাওয়াটা আরও নিষ্ঠুর। আরও দুঃসহ। এবার যেন সত্যি সত্যিই শূন্য হয়ে গেল বাড়ি।

একটা শুধু রং নাম্বার

ডিসেম্বরের সকাল। শীতটা এ বছর বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে কলকাতায়। শাল কম্ফর্টারে নিজেকে মুড়ে ড্রয়িং হলে খবরের কাগজ গিলছিল পার্থ। আরতি চা রেখে গেছে, ধোঁয়া উঠছে গরম পেয়ালা থেকে। প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে মিতিন সোফায় এসে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে পার্থর স্বরযন্ত্র সরব—সুপ্রভাত মহারানি। তোমার জন্য আজ বিস্তর খবর আছে।

—কী রকম?

—কাল রাতে এক রইস্ বাড়ির ছেলে পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে গাড়ি তুলে দিয়েছে। তিন জন জখম। বাবুর সঙ্গে তার বান্ধবীও ছিলেন। দু'জনেই নাইট ক্লাবে হুল্লোড় করে ফিরছিল, ড্রাগে চুর অবস্থায়।

—এ তো রোজকার ইনসিডেন্ট। নাইট ক্লাব-টাবগুলোই তো এখন নেশার ঠেক।

—তার পর ধরো, মধ্যপ্রদেশে এক বৃক্ষমানবের সন্ধান মিলেছে। কুড়ি বছর ধরে তিনি নাকি গাছেই আছেন।

—পুরনো নিউজ। কাল টিভিতে দেখিয়েছে!

—তা হলে এ বার একটা আনকোরা নিউজ দিই? চায়ে চুমুক দিয়ে পার্থ আয়েশ করে বসল—আজ এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। ভোরবেলায় উড়ো ফোন।

—মানে?

—তখন বোধ হয় পাঁচটা-টাচটা হবে। ভাল করে আলোও ফোটেনি। হঠাৎ আমার মোবাইল ঝনঝন। তুমি তো তখন দিব্যি নাক ডাকাচ্ছ, আমিই কম্বলসুদ্ধু গিয়ে ফোনটা ধরলাম। অমনি মোটা মোটা গলার নির্দেশ, এক্ষুনি নক্ষত্র

চ্যানেলটা এক বার খোলো, ব্যাপারটা আবার দেখাচ্ছে!

কোন ব্যাপার?

—সেই যে, একটা ছেলে ইভটিজিংয়ের প্রোটেস্ট করতে গিয়ে ঝাড় খেল...। তার ইন্টারভিউটাই ফের টেলিকাস্ট হচ্ছিল। ধুৎতেরি বলে টিভি অফ করে বিছানায় ফিরেছি, এগেন লোকটার ফোন। দেখলে তো, এখনও কেমন ব্যাপারটাকে জিইয়ে রেখেছে! আমিও তৎক্ষণাৎ দিয়েছি ধ্যাতানি। ব্যাস, রং নাম্বার বলে ওমনি লোকটা লাইন কেটে দিল।...বখেড়াটা বোঝো, এই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় কম্বল থেকে বার করে পরপর দু'বার...

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ—প্রায় ভোররাত্তিরে এক জন আর এক জনকে ফোন করে টিভির একটা বিশেষ প্রোগ্রাম দেখতে বলছে...কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি যেন!

—যাচ্চলে, ওমনি টিকটিকিপনা শুরু করে দিলে? কোথায় কে ভুলভাল নাম্বারে রিং করে কী বলেছে...

—অর্থাৎ ঠিক নাম্বার একটা আছে। লোকটা আদতে যেখানে ফোন করতে চাইছিল। মিতিন জোরে জোরে ঘাড় নাড়াল—উঁহু, মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শীতের ভোরে ঘোরতর ইমারজেন্সি না থাকলে কেউ কাউকে ফোন করে না। টিভিতে এ রকম একটা প্রোগ্রাম দেখার জন্য তো নয়ই। তাও কিনা এক বার নয়, দু-দু'বার। অতএব যদি করে, তবে ধরে নেওয়া যায়, দু'পক্ষই ওই কেসে ইন্টাররেস্টেড পার্টি।

—কী ভাবে?

—ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। গত শনিবার রাতে মেট্রোরেলের ফাঁকা কামরায় দুটো ছেলে একটি মেয়ের সঙ্গে অশোভন আচরণ করছিল। পলাশ সামন্ত নামে এক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ঘটনাটার প্রতিবাদ করে, তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলে দুটো তাকে বেধড়ক পেটায়, এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশন এলে তাকে ধাক্কা মেরে প্ল্যাটফর্মে ফেলে দেয়। তার পর চার-চারটে দিন কেটে গেছে, টিভিতে, নিউজ পেপারে ব্যাপারটা নিয়ে কম হইচই হয়নি, কিন্তু এখনও কালপ্রিটরা বেপাত্তা, মেয়েটারও কোনও ট্রেস নেই। এমত অবস্থায় ওই অসময়ে একটা বাসি প্রোগ্রামের রি-টেলিকাস্ট দেখার আগ্রহ কাদের থাকতে পারে? হয় যারা ছেলে দুটোর সঙ্গে কোনও ভাবে রিলেটেড, নয়তো মেয়েটার সঙ্গে। এবং লোকটার ভাষাই বলে দিচ্ছে, প্রোগ্রামটার পুনঃপ্রচারে সে মোটেই আহ্লাদিত নয়। ঠিক বলছি?

—হ্যাঁ, তাই দাঁড়াচ্ছে বটে। পার্থ আলোয়ান থেকে হাত বার করে ঘাড় চুলকোল—আমি অবশ্য এই অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবিনি।

—স্বাভাবিক। তুমি তো আমার মতো টিকটিকি নও। মিতিন সামান্য হাসল—যাও, চট করে তোমার মোবাইলটা নিয়ে এসো।

সেলফোন হাতে পেয়ে টুপটাপ বোতাম টিপল মিতিন। প্রার্থিত নম্বরটি দেখে ভুরুতে ভাঁজ—এ তো ল্যান্ড লাইনের নাম্বার! প্রাইভেট কোম্পানির। নট বি এস এন এল।

—তাই নাকি?

—হুঁ প্রথম কলটা এসেছে পাঁচটা চারে, দ্বিতীয়টা পাঁচটা সতেরোয়। আর এক বার খুদে মনিটরে চোখ বুলিয়ে চলভাষ যন্ত্রটি পার্থকে বাড়িয়ে দিল মিতিন—এক কাজ করো, এবার তুমি লোকটাকে একটা ফোন লাগাও।

—কেন?

—জিজ্ঞেস করো, কী জন্য হঠাৎ ওই প্রোগ্রামটা তোমায় দেখতে বলছিল।

—আর থোড়াই বলবে। সে তো ভুল করে আমার নাম্বারে...

—আহা, প্রশ্ন করতে দোষ কী! করো না একটু খোঁচাখুঁচি। আর মাইক্রোফোনটা অন রাখো, আমি লোকটার ভয়েস শুনতে চাই।

পার্থ এতক্ষণে ভারি উৎসাহ পেয়েছে। নম্বর টিপে অপেক্ষা করল। বেশ খানিকক্ষণ রিং বাজার পর ওপারে এক ওজনদার গলা—হ্যালো!

স্বর মিহি করে পার্থ বলল—আপনি আজ ভোরবেলা আমাকে একটা টিভি চ্যানেল খুলতে বলছিলেন...

—ও, আপনি? ও প্রান্ত সামান্য থমকে থেকে বলল—তখনই তো বললাম, রং নাম্বার হয়ে গেছে।

—আমি কিন্তু টিভি চালিয়েছিলাম। নক্ষত্র চ্যানেলে তখন একটা রিসেন্ট ইভটিজিংয়ের কেস দেখাচ্ছিল। আপনি নিশ্চয়ই ওটার কথাই বলছিলেন?

—না, না। সে রকম কোনও ব্যাপার ছিল না। ওটা জাস্ট একটা মিসটেক।

—কোনটা মিসটেক স্যার? প্রোগ্রামটা দেখতে বলা? নাকি আর কাউকে করতে গিয়ে আমায় ফোন করে ফেলা?

—আশ্চর্য, এক কথা নিয়ে ন্যাগ করছেন কেন? বলছি তো, ভুল হয়েছে।

—আপনার ভুলের জন্য আমাকে কিন্তু সাতসকালে বিছানা ছাড়তে হয়েছে। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা জানার তো অধিকার আছে স্যার। পার্থ একটু দম নিল—প্রোগ্রামটায় আপনার এত আগ্রহ কেন? আপনি কি ওই দুই

ইভটিজারকে চেনেন? কিংবা মেয়েটাকে? অথবা হতভাগ্য ছেলেটিকে?

—না।

—আপনি যাকে ফোন করছিলেন, তিনি কি...?

—ওফ্, হরিবল্।

বলেই কট্ করে কেটে দিয়েছে লাইনটা। পার্থ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—দেখলে তো, কিস্যু বোঝা গেল না।

—একদম উল্টো। মিতিন ঈষৎ গম্ভীর—লোকটা যে টিভি প্রোগ্রামটা নিয়ে কথাই বলতে চাইল না, এটাই তো যথেষ্ট সন্দেহজনক। সম্ভবত তুমি তিন ঘণ্টা পর কল ব্যাক করবে, লোকটা ভাবতেই পারেনি। তা হলে অন্তত সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা উত্তর খাড়া করে রাখত।

—এখন তবে তোমার কী করণীয়?

—প্রথমে অনিশ্চয়দাকে একটা ফোন। তার পর ধাপে ধাপে এগোনো।

ভবানী ভবন থেকে সম্প্রতি লালবাজারে ফিরেছেন অনিশ্চয় মজুমদার। অতিরিক্ত নগরপাল হয়ে। নিজের পুরনো ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের উল্লাসে আজকাল ভারি ফুরফুরে মেজাজে থাকেন অনিশ্চয়। মিতিন ফোন করতেই তাঁর চেনা গলা বেজে উঠল—আরে, সাতসকালে প্রজ্ঞাপারমিতা! আছে কি কোনও মধুর বারতা?

—খুশি যে উথলে পড়ছে দাদা! এ দিকে শহরের তো যায় যায় দশা।

—কেন? কী হল? কে কোথায় গোল পাকাল?

—গোল তো পেকেই আছে। আপনার পুলিশ এখনও শনিবারের ইভটিজিংয়ের কেসটার কোনও কিনারা করে উঠতে পারল না।

—সেই মেট্রোরেল? এখনও অব্দি অবশ্যি আমরা ডাহা ফেল। অনিশ্চয়ের গলা যেন একটু হতাশ এ বার—কী করব? কাকে ধরব? সাক্ষী কোথায়? সবাই তো পালায়।

মিতিন হেসে ফেলল—হঠাৎ এত ছন্দে কথা বলছেন কেন?

—পুলিশ বলে কি কবি হতে পারি না? কাব্যচর্চা কি আমাদের মানা?

—ছি ছি, তা কেন। কাব্য রচনা তো প্রতিটি বাঙালিরই জন্মগত অধিকার। জানেন তো, পার্থও এক বার একটা কবিতা লিখেছিল। আমাকে ইমপ্রেস করতে। পরে অবশ্য ধরা পড়ে বুদ্ধদেব বসু থেকে টোকা।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছেন অনিশ্চয়। হেসেই চলেছেন। তাঁকে থামানোর জন্য মিতিন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—পুলিশ কি ভিক্টিম মেয়েটির কোনও সন্ধান

পেল, দাদা?

—নাহ্। কোথায় যে লুকোল সেই অবগুণ্ঠনবতী, বোঝে না এতে আল্টিমেটলি মেয়েদেরই ক্ষতি।

—চমৎকার অন্ত্যমিল। মিতিন হেসে বলল—শুনুন, আমি যদি প্রাইভেটলি কেসটা সমাধানের চেষ্টা করি, পুলিশের কি খুব আপত্তি হবে? একটা স্টেজে গিয়ে অবশ্য আপনাদের সাহায্য লাগবেই।

—ওয়েট, ওয়েট, আগে একটু বুঝি, ক্রিমিনাল পাকড়ানো তো আপনার রুটিরুজি। তারিফে উৎফুল্ল অনিশ্চয় ছন্দের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন—ছেলেটি আপনার ক্লায়েন্ট? মানে যে মার খেয়েছে, সে কি আপনাকে করেছে অ্যাপয়েন্ট?

—না দাদা, আমি অন মাই ওউন করতে চাই। দৈবাৎ একটা ক্লু পেয়েছি, একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

—কী ক্লু?

—সে তো আপনাকে পরে জানাবই। ইনফ্যাক্ট, কেসটা সল্‌ভ করতে পারলে কৃতিত্বটা আমি পুলিশকেই দিয়ে দেব। শুধু বলুন, আপনাদের অবজেকশান নেই তো?

—কিছুমাত্র না। বলেন তো ইভটিজিংয়ের সব ক'টা কেসই আপনাকে চালান করতে পারি। তাতে পুলিশের ঘাড় খানিক হাল্কা হয়। দিনকে দিন অসভ্যতা যা বাড়ছে...

—এক সেকেন্ড দাদা। এক্ষুনি একটা হেল্প করতে হবে যে। একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি, যদি কাইন্ডলি নাম অ্যাড্রেসটা আমায় লোকেট করে দ্যান...

—নো প্রবলেম। পেয়ে যাবেন। অফিসে গিয়েই পতা লাগাচ্ছি।

বাক্যালাপ সেরে নিত্যদিনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিতিন। রান্না নিয়ে আরতিকে টুকটাক নির্দেশ দান, তাড়া লাগিয়ে লাগিয়ে পার্থকে বাজারে পাঠানো, বুমবুমকে স্কুলের জন্য তৈরি করা...। সবই করছে, কিন্তু মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কেসটা। বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়চ্ছে না তো সে? তা ছাড়া মেয়েটাই যদি এ ভাবে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, অপমানটা নির্বিবাদে হজম করে নেয়, তা হলে মিতিনের ছোটাছুটি কি নেহাতই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে না? মেয়েদের এ রকম ছুঁইমুই স্বভাবের জন্য আগেও যে কত ইভটিজিংয়ের কেস ধামাচাপা পড়ে গেছে! এমন ধারা চলতে থাকলে আর কি কেউ মেয়েদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে?

বিকেল নাগাদ মিলল তথ্য। উড়ো ফোনের মালিকের নাম সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী। থাকেন শ্যামবাজারের কাছে, থ্রি বাই সি বৃন্দাবন দাস লেনে। এর সঙ্গে স্থানীয় থানার সূত্রে বাড়তি খবর, সত্যপ্রিয় নাকি পেশায় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। সে-দিনের ঘটনাটি যে পুলিশ অফিসার তদন্ত করছেন, তাঁর নামধামও দিয়ে দিলেন অনিশ্চয়ই। প্রয়োজনে মিতিন তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে পার্থকে ফোন করল মিতিন। শ্যামবাজার মেট্রোরেল স্টেশনের গেটে দাঁড়াতে বলল পার্থকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিজেও পৌঁছে গেছে।

সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর হদিশ পেতে অসুবিধে হল না। পুরনো একটা এক তলা বাড়ি, খোলা দরজার বাইরে চক্রবর্তী হোমিও হলের ছোট্ট সাইনবোর্ড। খান দুই সিঁড়ির পর প্রথমে ফালি মতন প্যাসেজ। রোগীদের বসার বেঞ্চি ছাড়াও বড় বড় দু'খানা কাচের আলমারি শোভা পাচ্ছে সেখানে। আলমারিতে থরে থরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। অদূরে সবুজ পর্দা, সম্ভবত ওষুধ বানানোর জায়গা। তার পাশে ছোট ঘেরাটোপে ডাক্তারের চেম্বার।

রোগীবিহীন চেম্বারে সত্যপ্রিয় একাই আসীন। বছর ষাটেক বয়স, মাথাজোড়া টাক, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি আর উলের জহরকোট। মলিন ঘরের অনুজ্জ্বল আলোতেও রীতিমতো চকচক করছে ভদ্রলোকের মুখখানা।

চেয়ার টেনে বসে থার্ড-আইয়ের কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে মিতিন সরাসরি বলল—আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি।

ভদ্রলোক থতমত। কার্ডখানা দেখছেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, প্রশ্ন? আমাকে কী ব্যাপারে?

—আজ ভোরবেলা একটি বিশেষ নম্বরে ফোন করে আপনি নক্ষত্র চ্যানেলের একটা প্রোগ্রামের কথা কাউকে বলছিলেন। কারণটা জানতে পারি?

সত্যপ্রিয় ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আপনাকে কে বলল?

—আপনার টেলিফোন নাম্বার। ওটি থাকলে নাম-ঠিকানা বার করে ফেলা তো কঠিন কাজ নয়।

—দ্যাখো কাণ্ড! সত্যপ্রিয় এ বার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েছেন—কোথায় কী একটা নম্বর টিপে ফেলেছি, ওমনি ডিটেকটিভের কাছে রিপোর্ট চলে গেল?

—ফোনটা আমার বাড়িতেই এসেছিল যে। মিতিন অল্প হাসল। পার্থকে দেখিয়ে বলল, আমার হাজব্যান্ডের মোবাইলে।

—ও, তাই বলুন। সত্যপ্রিয় অনেকটা সহজ হয়েছেন—গোয়েন্দাগিরি করেন বলেই বুঝি কৌতূহল নিরসনে ছুটে এসেছেন?

—হুম্। কারণ প্রোগ্রামটির বিষয়বস্তু যে অত্যন্ত ডেলিকেট। অত ভোরে ইভটিজিংয়ের ইন্টারভিউটি কোনও এক জনকে দেখানোর জন্যে কেন যে আপনি উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন...!

সত্যপ্রিয় কয়েক সেকেন্ড নীরব। তার পর টেবিলের পেপারওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, তা হলে সত্যিটাই বলি। ফোনটা আমি করতে চাইছিলাম আমার এক বন্ধুর ছেলেকে। যে ওই ঘটনাটার সময়ে ওই কামরাতেই প্রেজেন্ট ছিল। তার বক্তব্য, সেদিন ইভটিজিং-ফিজিং কিস্যু হয়নি। দুটো ছেলের সঙ্গে ওই পলাশ সামন্ত না কী যেন নাম, খুব ঝগড়া লেগেছিল। পলাশই আগে হাত চালায়, তার পর এসপ্ল্যানেড স্টেশনে ওদের হাত ছাড়িয়ে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। ছেলেটা স্রেফ আক্রোশের বশে একটা আষাঢ়ে গপ্পো বানিয়েছে। অ্যাক্চুয়াল ঘটনাটা শুনেছি বলেই হঠাৎ প্রোগ্রামটা দেখে আমার খুব মজা লাগছিল। ওকে আর একবার তাই দেখতে বলছিলাম।

পার্থ ফস্ করে বলে উঠল, আপনার বন্ধুর ছেলে যখন প্রত্যক্ষদর্শী, সে প্রকৃত ঘটনাটা পুলিশকে জানাচ্ছে না কেন?

—লাভ কী বলুন? অলরেডি একটা গল্প চাউর হয়ে গেছে, এখন উল্টো কিছু বলা মানেই তো অযথা কন্ট্রোভার্সিতে জড়িয়ে পড়া। কারণ, সে-ও তো এখন প্রমাণ করতে পারবে না ইভটিজিং হয়নি।

—তবু তার নাম আর ফোন নাম্বারটি কি পেতে পারি?

সত্যপ্রিয় একটুক্ষণ গোঁজ। তার পর কী ভেবে যেন উঠে গেলেন অন্দরে। মিনিট তিন চার পর এক চিরকুট হাতে ফিরছেন। গোমড়া মুখে বললেন—এই নিন পাপুর মোবাইল নাম্বার। তবে কাইন্ডলি সত্যিটা ফ্ল্যাশ করার জন্যে ওকে ফোর্স করবেন না। ও কিন্তু আমার ওপর খুব রাগ করবে।

কাগজের টুকরোটা ব্যাগে রেখে মিতিন উঠে পড়ল। রাস্তায় এসে পার্থ বলল, কেস তো পুরো গুবলেট হয়ে গেল!

—উম্। যদি সত্যপ্রিয়বাবুর কথা সত্যি হয়।

—মিথ্যে হওয়ার তো কোনও কারণ দেখি না। এনিওয়ে, কনফার্মড্ হয়ে নাও। পাপুকে ফোন করো। প্লাস, পলাশ সামন্তকেও চেপে ধরো। কমপেয়ার করলেই প্রকৃত ঘটনা টেরে পেয়ে যাবে।

—সত্যি জানার আরও একটা উপায় আছে স্যার। তুমি যদি একটা রং

নাম্বারে কল করে বসো, ঠিক তার পরেই কী করবে?

—আসল নাম্বারটা...। বলেই পার্থর চোখ বড় বড়—নেক্সটা কলটা যাচাই করলেই তো বোঝা যাবে ডাক্তারবাবু ফল্‌স মারলেন কি না।

মিতিন মুচকি হাসল—চলো, আগে তা হলে সেই চেষ্টাটাই করি।

মিতিনের অনুমানই ঠিক। ডাক্তার সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীর কললিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন অনিশ্চয়। তালিকা বলছে, বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা উনিশে, অর্থাৎ পার্থকে দ্বিতীয় কলটি করার পর পরই আর একটি টেলিফোন করেছিলেন ডাক্তারবাবু। এবং সেটি মোটেই তাঁর দেওয়া নম্বরটি নয়। বরং সে নাম্বারের সঙ্গে পার্থর সেলফোন নাম্বারের দারুণ মিল। শুধু মাঝের একটা সংখ্যা যা আলাদা।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে খবরটা শুনেই পার্থ মহা উত্তেজিত—তা নাম্বারটি কার জানা গেছে?

—জনৈক সুব্রত বিশ্বাসের। নিবাস কালীঘাটের সুরেশ হালদার রোড।

—আর পাপুর নাম্বার নিশ্চয়ই ফিক্‌টিশাস?

—নো স্যার। ওই মোবাইলটির গ্রাহক বেহালার এস এন রায় রোডের অজেয় শিকদার। যার ডাক নাম পাপু হলেও হতে পারে। সত্যপ্রিয়বাবু ওই নাম্বারেও কাল দু'বার ফোন করেছিলেন। সকাল আটটা সাঁইত্রিশে, এবং সন্ধে সাতটা ছাব্বিশে। বলেই মিতিন একগাল হাসল—টাইম দুটো নোটিস করো। প্রথমটা, তুমি সকালে ভদ্রলোককে যখন রিং করলে, তার পর পরই। আর দ্বিতীয়টার সময়ে আমরা সত্যপ্রিয়বাবুর চেম্বারে।

—তার মানে আমাদের বসিয়ে রেখে, ফোনটা সেরে এসে, তার পরে তোমাকে নাম্বারটা...। পার্থ দুম্ করে চটে গেল: ডাক্তার তো বহুৎ ঘোড়েল। এভাবে মিসলিড করার অর্থটা কী?

—সেটাই তো বুঝতে চাইছি।

—পলাশ সামন্তর সঙ্গে কথা হয়েছে?

—দুপুরে আজ যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে মিট করে এসেছি। সে তো এখনও নিজের পয়েন্টে স্টিক করে আছে। বিডন স্ট্রিটে বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে গিরিশ পার্ক থেকে লাস্ট মেট্রোয় টালিগঞ্জে ফিরছিল। ছেলে দুটো আর মেয়েটা আগে থেকেই ছিল কামরায়। দুই মক্কেলের এক জন মেয়েটাকে খুব জ্বালাতন করছিল, আর মাঝে মাঝেই ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল মেয়েটা। প্রায় ফাঁকা

কামরার অন্য যাত্রীরা কেউ কিছু বলছে না দেখে ছেলেটা শিভালরি দেখিয়ে এগিয়ে যায়, তার পর কথা কাটাকাটি, মারামারি...

—হুম্। ব্যাপারটা এ বার আন্দাজ করা যাচ্ছে। পার্থ বিজ্ঞের মতো মাথা দোলালো—নির্ঘাত বদমাইশ দুটোর এক জন সত্যপ্রিয়র রিলেটিভ। তাকে আড়াল করতেই আদৌ ইভটিজিং হয়নি এমন একটা কাহিনি ফেঁদেছে ডাক্তার।

—উঁহু, কেসটা বোধ হয় অত সরল নয়। একটা কোনও প্যাঁচ আছে!

—কী প্যাঁচ?

—ভাবছি।

—আমার তো মনে হয়, পাপুর সঙ্গে যোগাযোগ করে আর লাভ নেই। ডাক্তার ব্যাটা নির্ঘাত তাকে পড়িয়ে রেখেছে, তার কাছ থেকে নতুন কথা শোনা যাবে না। ...বরং সুব্রত বিশ্বাসের ডেরায় হানা দিই চলো।

মিতিনেরও সে রকমই ইচ্ছে। তবে রাতে আর বিশদ আলোচনায় গেল না। বিমনা মুখে ভাবছে কী যেন। ভেবেই চলেছে।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়ল পার্থকে নিয়ে। ট্যাক্সি ধরে সোজা কালীঘাট। ঠিকানা খুঁজে দশ নম্বর সুরেশ হালদার রোডের আবাসনটির সামনে এসে যখন দাঁড়াল, ঘড়িতে তখন ন'টা পঁচিশ।

বাড়ির নীচ তলাটায় গ্যারেজ। খান পাঁচেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। লিফ্‌টের খাঁচার পাশে, দেওয়ালে সার সার লেটার বক্স। একটার গায়ে বিশ্বাস পদবিটা জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু কোন তলায় তার কোনও উল্লেখ নেই। দারোয়ান-টারোয়ানও দেখা যায় না ধারেকাছে। কাকে যে জিজ্ঞেস করে?

মুশকিল আসান হতে অবশ্য সময় লাগল না। এক প্রবীণ মানুষ থলি ভর্তি বাজার নিয়ে ভেতরে ঢুকছিলেন, পার্থ দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরেছে। সুব্রত বিশ্বাস নামটা শুনেই বৃদ্ধের কপালে ভাঁজ। কাঠ কাঠ গলায় বললেন—ফোর্থ ফ্লোর। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে ডান দিকে।

মিতিনের সঙ্গে বৃদ্ধও ঢুকেছেন লিফ্‌টে। তিন চার, দুটো বোতামই টিপে দিয়ে বললেন—গানের প্রোগ্রামের ব্যাপারে এসেছেন বুঝি?

মিতিনের সপ্রতিভ জবাব—হ্যাঁ।

—বেশি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন। দেখুন, দ্যাবাদেবী ঘুম থেকে উঠেছেন কি না!

—ওঁরা বুঝি লেট রাইজার?

—নিশাচরদের খোঁয়াড়ি ভাঙতে খানিক দেরিই হয়।

মন্তব্যটা ছুড়ে দিয়ে তিন তলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। চার তলায় পৌঁছে মিতিনরা নির্দিষ্ট দরজায় এসে বেল বাজাল। কোনও সাড়া নেই। আবার বাজাল বেল। আবার।

অবশেষে খুলেছে দুয়ার। ডোরাকাটা নীল পাজামা আর ফুলহাতা টিশার্ট পরা এক যুবক নিদ্রা জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কোত্থেকে আসছেন?

সঙ্গে সঙ্গে মিতিনের পাল্টা জিজ্ঞাসা—আপনি নিশ্চয়ই সুব্রত বিশ্বাস?

—হ্যাঁ। কেন বলুন তো?

মিতিন নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল। ঢুলুঢুলু চোখে নামটা পড়েই সুব্রতর ঘুম নিমেষে উধাও। চৌকো মুখখানা পলকের জন্য কঠিন, পরক্ষণে বাঁকাচোরা হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলল, এসে গেছেন তা হলে?

মিতিন তেরচা চোখে তাকাল—আমাদের এক্সপেক্ট করছিলেন মনে হচ্ছে?

—অবশ্যই। ...আসুন, ভেতরে আসুন। মিতিন-পার্থকে সোফায় বসতে বলে সুব্রত হাই তুলল—চোখেমুখে একটু জল ছিটিয়ে আসতে পারি?

—নো প্রবলেম। আমরা ওয়েট করছি। ড্রয়িংহলের ও প্রান্তের ঘরটায় ঢুকে গেল সুব্রত। চোখ ঘুরিয়ে মিতিন চার দিকটা দেখছিল। ছোট জায়গাটায় আছে অনেক কিছু, তবে চরম অগোছালো দশায়। যেমন তেমন ভাবে পড়ে আছে ডিভিডি প্লেয়ার, মিউজিক সিস্টেম, রাশি রাশি সিডি যত্রতত্র ছড়ানো। ডাইনিং টেবিলে গ্লাস, আধখাওয়া মদের বোতল, গোছা খানেক সিগারেট পেপার, পোড়া ফিল্টার-টিপ্‌ড সিগারেটের টুকরো আর ছাই বোঝাই অ্যাশট্রে, একখানা ক্যারিব্যাগ...। কেমন যেন ছন্নছাড়া সংসার।

পার্থ আধখাওয়া বোতলটা পর্যবেক্ষণ করে এল। উঁকি দিয়েছে টিভির বাক্সতেও। ফিরে নিজস্ব বিজ্ঞ মতামত জাহির করতে যাচ্ছিল, সুব্রত এসে পড়েছে। মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, এ বার বলুন কী জানতে চান?

মিতিন বাঁকা সুরে বলল—আমরা আসব, এটা অনুমান করেছেন। কিন্তু কেন এসেছি, তা বুঝতে পারছেন না?

—পারছি বইকী। সত্যপ্রিয়বাবু...মানে সত্যকাকু আমায় সবই জানিয়েছেন। পরশু ভোর থেকে যা যা ঘটেছে এভরিথিং। সুব্রত সামান্য থেমে থেকে বলল—টু স্পিক দ্য ট্রুথ, আমার ফোন নাম্বার দিতে সত্যকাকুর দ্বিধা ছিল। ইচ্ছে করেই উনি আমার বন্ধু পাপুর নাম্বারটা আপনাদের দেন। অবশ্য পাপুকে জানিয়েই। পরে সত্যকাকুর মনে হয়, কাজটা বোধ হয় উচিত হল না। কারণ, বৃহস্পতিবার ভোরে উনি যে আমাকেই ফোন করছিলেন, সেটা বার করাও

আপনাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। সত্যকাকু তাই আমাকে বলেন, আপনারা এলে যেন খোলাখুলি কথা বলে নিই।

পার্থ দুম্ করে বলে উঠল—তার মানে পাপু নয়, আপনিই সে-দিনকার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী?

—তা কেন? পাপুও ছিল আমার সঙ্গে। সুব্রত মুচকি হাসল, সত্যি বলতে কী, আমি আর পাপুই তো সেই রাত্তিরের খলনায়ক। মিডিয়ার প্রচার এবং ওই মাথাগরম ছোকরার সৌজন্যে।

—ঠিক বুঝলাম না।

—আরে বাবা, সে-দিন কোনও ইভটিজিং-ফিজিং হয়ইনি। যে মেয়েটিকে ঘিয়ে মেট্রোর কামরায় অশান্তি, সে আমার স্ত্রী। লিগালি ম্যারেড ওয়াইফ। পারসোনাল কারণে আমার মিসেসের সঙ্গে সে-দিন আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল, তাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম...। আমাদের সেই মান-অভিমানের দৃশ্যকেই ইভটিজিং ধরে নিয়ে পলাশ নামের ছেলেটা আচমকা আমাদের অ্যাটাক করে, ফলে বাধ্য হয়ে আমি আর পাপু একটি অযাচিত মারামারিতে জড়িয়ে পড়ি।

পাজামার পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করল সুব্রত। সেন্টার টেবিলের তলা থেকে পুঁচকে অ্যাশট্রেখানা তুলে রাখল কাচের ওপর। পার্থকে বাড়িয়ে দিল প্যাকেট। নিজেও একখানা সিগারেট ধরিয়েছে। ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে কৌতুকের সুরে বলল—এ বার নিশ্চয়ই বুঝতে কোনও অসুবিধে নেই?

পার্থ আমতা আমতা করছে—না... মানে...তবু...

—এক সেকেন্ড। সুব্রত গলা চড়াল, রিমি...? রিমি...?

নাইটির ওপর শাল জড়ানো এক তরুণী এসেছ পর্দা সরিয়ে। সোনালি রং করা স্টেপকাট চুল খানিক আলুথালু। প্রসাধনহীন ফোলা ফোলা মুখ বলে দেয়, সে-ও এইমাত্র শয্যা ছেড়েছে।

কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে সুব্রত বলল—মেট্রোর ঘটনাটা এঁদের শুনিয়ে দাও তো।

—ছি ছি, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। রিমি জিভ কাটল—ভাবতে পারিনি ও রকম একটা সিচুয়েশান তৈরি হবে।

পার্থ ভুরু কুঁচকে বলল—তা এটা এত হাশ-হাশ করার কী আছে? পুলিশকে জানিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

—সমস্যা আছে দাদা। সুব্রত ছাই ঝাড়ল, রিমি পার্ক স্ট্রিটের গোল্ডেন

ঈগলে গান গায়। আমি এক জন ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট। পাপুও। আমরা রিমির সঙ্গে বাজাই। সবে নাম করছি, এ সময়ে কোনও সিলি স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে গেলে আমাদের কেরিয়ারের ক্ষতি হতে পারে। স্পেশালি রিমির। এমনিতেই তো নাইট ক্লাব সিংগারদের চাটনি-চানাচুর বানালে পাবলিক চেটে চেটে খায়। এ রকম একটা কাণ্ডে আমাদের প্রেজেন্স টের পেলে মিডিয়াই হয়তো রটিয়ে দিত, আমরা ড্রাঙ্ক ছিলাম, বেলেল্লাপনা করছিলাম। তা ছাড়া ওই ঘটনায় কেউ তো কোনও সিরিয়াস বিপদে পড়েনি, হ্যারাসড্‌ও হচ্ছে না, তা হলে আমরা কেন যেচে পুলিশের ট্রাবল ঘাড়ে নিতে যাব? পলাশ সামন্ত যদি স্টোরি বানিয়ে সুখ পায়, বানাক না যত খুশি।

পার্থর তবু খুঁতখুঁতুনি যাচ্ছে না—স্টিল, অত ভোরে আপনাদের ফোন করাটা কিন্তু একটু অদ্ভুত মনে হয়। যেখানে ডক্টর চক্রবর্তী জানেন আপনারা লেট নাইট করেন...!

—আমিই সত্যকাকুকে বলে রেখেছিলাম, ইন্টারভিউটা আবার দেখানো হলে উনি যেন আমায় জানান। সুব্রত অ্যাশট্রেতে সিগারেট নেবাল—প্রোগ্রামটা আগে আমি দেখিনি তো...। সত্যকাকু খুব ভোরে ওঠেন, হঠাৎ প্রোগ্রামটা চোখে পড়তেই ওঁর বোধ হয় আর তর সয়নি। তাড়াহুড়ো করে ভুল নাম্বারে...

—হুম্। মিতিন এত ক্ষণে মুখ খুলেছে—তা সে-দিন রাত্তিরে আপনারা ফিরছিলেন কোত্থেকে?

—সত্যকাকুর বাড়ি থেকেই। সুব্রতর স্বরে ঈষৎ ব্যঙ্গ, এর পর নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কোথায় যাচ্ছিলাম? নাইট ক্লাব? না বাড়ি? কিংবা সত্যকাকু আমার কী ধরনের আত্মীয়? ডাইরেক্ট কাকা? নাকি বাবার বন্ধু?

—বোধ হয় আর কিছু না জানলেও চলবে। মিতিন উঠে দাঁড়াল, আপনাদের ডিস্টার্ব করার জন্য দুঃখিত। চলি।

নীচে এসে ফের ট্যাক্সি। সিটে বসে পার্থ গজগজ করে উঠল, হল তো? দড়িকে সাপ ভেবে নেওয়ার ফল হাতে হাতে পেলে?

মিতিন টুঁ শব্দটি করল না।

—আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে আর বেরোচ্ছি না। প্রেসে একটা ফোন করে দেব, তার পর টেনে ঘুম।

মিতিন যেন শুনতেই পেল না। মুখে বুঝি কুলুপ এঁটেছে। বাড়ি ফিরেও গুম!

পার্থ মজা পেয়ে গেছে। খোঁচাতে শুরু করল, কেস কেঁচে গেল বলে

আপসেট? নাকি ফেলিওরটা মানতে পারছ না?

—ঠিক তা নয়। বহুক্ষণ পর মিতিনের সাড়া মিলল, সুব্রতর গল্পটা নিয়ে ভাবছি। একটুও জমল না। সত্যপ্রিয়বাবুর স্টেটমেন্টের সঙ্গে বিস্তর অসঙ্গতি।

—কী রকম?

—প্রথমত, সত্যপ্রিয়বাবু নাকি ফোন করছিলেন বন্ধুর ছেলেকে, যে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু সুব্রতর স্টোরিতে আইউইটনেস ভ্যানিশ। সে নিজেই নাকি ঘটনায় ইনভলভ্‌ড। পাপুও।

—আহা, সেতো সুব্রতকে বাঁচাতেই সত্যপ্রিয়বাবু...

—তার পর ধরো, অ্যাকর্ডিং টু সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, তিনি ইন্টারভিউটা আবার এক বার দেখতে বলছিলেন। অথচ সুব্রতর ভার্সান, সে আগে ইন্টারভিউটা দেখেইনি। অতএব দু'জনের এক জন কেউ নিশ্চয়ই মিথ্যে বলছে।

—না-ও হতে পারে। ওটা হয়তো ডাক্তারবাবুর জাস্ট স্লিপ অব টাং।

—ডাক্তারটিকে কি তোমার জিভ আলগা মানুষ বলে মনে হয়? এনিওয়ে, বোধোদয় যখন হলই, সত্যপ্রিয়বাবু তো তখন তোমাকেই ফোন করে সুব্রতর নাম্বারটা দিয়ে দিতে পারতেন। ওঁর কাছে তো আমার কার্ডই আছে। ঠিক কি না?

—হয়তো হাতের কাছে পাননি। সুব্রতকে জানিয়ে দায়িত্ব সেরে রেখেছেন।

—ভুলভাল ডিফেন্স। তার পর...সুব্রতরা যে সে-দিন তাঁর কাছেই গিয়েছিল, সেটাও কিন্তু সত্যপ্রিয়বাবু সুচারু ভাবে চেপে গিয়েছেন। মিতিনের চোখ সরু হল—ওয়ান মোর পয়েন্ট। সুব্রত খাচ্ছে প্যাকেটের সিগারেট, ডাইনিং টেবিলের অ্যাশট্রেতেও ফিলটার-টিপ্‌ড সিগারেটের পোড়া টুকরো, অথচ হাতে বানানো সিগারেটের কাগজ গোছা করে রাখা...ব্যাপারটা কেমন যেন বিপরীতধর্মী না?

—তুমি কিন্তু বড্ড খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করছ। পার্থ রীতিমতো বিরক্ত : চাইলে ও-রকম অনেক ফাঁক বার করা যায়। যেমন ধরো, টিভির ঢাউস বাক্সে মদের বোতলের খাপ, পাশেই সুগার অব মিল্কের প্যাকেট, কিংবা...

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। মিতিন সহসা টানটান—তুমি দেখেছ সুগার অব মিল্কের প্যাকেট?

—শিওর।

—ভুল করছ না?

—প্রশ্নই আসে না। খালি প্যাকেটটার গায়ে স্পষ্ট লেখা...

—তা হলে তো পেয়েই গেছি। মিতিন লাফিয়ে উঠল, এই সহজ সমাধানটা যে কেন এতোক্ষণ মাথায় আসেনি?

—কী সমাধান?

—বলছি। আগে দরকারি কাজটা সেরে নিই। মোবাইলে টপাটপ আঙুল চালাল মিতিন। মাইক্রোফোন অন করে খুদে যন্ত্রটি কানে চেপেছে—হ্যালো, অনিশ্চয়দা? ইভটিজিং মিষ্ট্রি ইজ ওভার। খুব মারাত্মক কেস। আপনি এক্ষুনি ফোর্স পাঠান। দু'জায়গায়। এক দল যাক দশ নম্বর সুরেশ হালদার রোডে সুব্রত বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে, অন্য টিম থ্রি বাই সি বৃন্দাবন দাস লেনের চক্রবর্তী হোমিও হলে। সুব্রত বিশ্বাস, রিমি বিশ্বাস, আর সত্যপ্রিয় চক্রবর্তীকে ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করুন।

—কেন? কেন?

—নিষিদ্ধ ড্রাগ বিক্রির অপরাধে। সুব্রতর ফ্ল্যাট সার্চ করলেই ড্রাগ পেয়ে যাবেন। সম্ভবত হেরোইন। সুব্রত, রিমি আর পাপু গোল্ডেন ঈগল নাইট ক্লাবের বাছা বাছা ক্লায়েন্টদের দ্রব্যটি সাপ্লাই দেয়। সিগারেট পেপারের মোড়কে। আর সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী ড্রাগচক্রের পাণ্ডা। তার কাজ ড্রাগ আনা এবং পেডলারদের ডিস্ট্রিবিউট করা। হোমিও হলের সমস্ত সুগার অব মিল্কের প্যাকেট সিজ করলেই মাদকটি মিলে যাবে। পাপু ওরফে অজেয় শিকদারকেও ছাড়বেন না। কেটে পড়ার আগে তাকেও পাকড়াও করুন।

কথা সেরে সোফায় শরীর ছেড়ে দিল মিতিন। পার্থর মুখ হাঁ হয়েই আছে। অনেকক্ষণ পর স্বর ফুটল, তুমি কী করে এত জোর দিয়ে বলছ..?

—দুয়ে দুয়ে চারই হয় মশাই। তিনও নয়, পাঁচও নয়। মিতিন মিটিমিটি হাসছে, কেসটাকে পর পর সাজাও। মন দিয়ে ভাবো। উত্তর পেয়ে যাবে।

বাড়ি

সেদিন অফিস-ফেরতা মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যেমন যাই, হপ্তায় এক-দু'বার। বাইরের ঘরে পাতা আদ্যিকালের সোফাটায় সবে বসেছি, নজরে পড়ল মাতৃদেবীর মুখখানি একেবারে তোলো হাঁড়ি। ঠোঁটে কুলুপ, ভুরুতে মোটা মোটা ভাঁজ। অন্য দিন তো চৌকাঠ পেরনো মাত্র মা কলকল করে ওঠে, আজ হলটা কী!

চোখের ইশারায় প্রমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কেসটা কী রে? শাশুড়ির সঙ্গে ফের লাঠালাঠি?

প্রমিতা হেসে ফেলল,—না গো দিদি। আজ বাংলা-বিহার নয়। ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান।

—মানে?

—দুপুরে আজ কালবৈশাখী হল না...তখন ঝড়ে-পড়া কয়েকটা আম কুড়িয়েছিল মা। আমাদেরই এলাকা থেকে। দোতলার ওরা দেখতে পেয়েই ব্যস্। চিৎকার হল্লা গালিগালাজ।

মেজাজটা টকে গেল। ওফ্, সেই অনন্ত অশান্তি! প্রায় তিন যুগ আগে সূচনা হয়েছিল বিবাদের, বাড়িওয়ালা উচ্ছেদের মামলা করেছিল বাবার নামে। তার পর কত কোটি কিউসেক জল যে বয়ে গেল গঙ্গা দিয়ে। নদীর দু'পাড়ে ভাঙনও তো কম হল না। গত হলেন সূর্য চাটুজ্যে, ওপরের জেঠিমাও। আমার বাবাও বছর ষোলো আগে পরপারে। আমরা মেয়েরাও বিয়ে-থা হয়ে ছিটকে গেছি যে যার মতো। মৃত্যুও থাবা বসিয়েছে আমাদের জেনারেশানে। সূর্যজেঠার ছোট ছেলে মণ্টুদার প্রয়াণ ঘটল অকালে, আমার বড় ভাইটিও অসময়ে মায়া কাটাল পৃথিবীর। কিন্তু সেই মামলাটি এখনও মহাকালের গর্ভে। এবং যুদ্ধ

থামারও কোনও লক্ষণ নেই। আদালতে কবজা করতে না পেরে এখন বাঁকা পথ ধরেছে ও পক্ষ। কখনও করপোরেশনের জল বন্ধ করে দেয়, তো কখনও ওপর থেকে আবর্জনা ঢালে দেদার। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, বাক্যবাণ তো হানছেই অহরহ।

ধুন্দুমারও বাধে। মাঝে মাঝেই। ঝগড়া বাধানোর কত রকম ফন্দিফিকির যে আছে। ভাড়াটের কাজের লোকরা চিরটাকাল বাড়ির পিছন-ভাগের বাথরুমখানা ব্যবহার করে এসেছে, অকস্মাৎ এক সকালে সেটি তালাবন্ধ। মুরোদ থাকে তো ভাঙ, ফৌজদারি ঠুকে দেব! উঠোনের মাঝ বরাবর পাঁচিল উঠে গেল রাতারাতি—ভাড়া তো নিয়েছ একতলার ঘর, উঠোনের জমিদারি ভোগ করবে কেন!

দু-দু'বারই ঝামেলাটা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কাজের কাজ অবশ্য কিছুই হয়নি। এ পক্ষের নালিশ শুনে ও পক্ষকে কোমল ধমক দিয়ে চা সন্দেশ-টন্দেশ সাঁটিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন দারোগাবাবু। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের লড়াইয়ে উকিল-পুলিশদেরই তো পোয়াবারো।

কাঁহাতক আর হাঙ্গামা হুজ্জোত ভাল লাগে? তাও আবার তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে? আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে, না কী?

বেজার মুখে মাকে বললাম,—কেন যে ওদের আমে হাত দিতে যাও?

—কোন সুবাদে ওদের আম? মা ঝেঁঝে উঠল সহসা।—সমু আম খেয়ে উঠোনের ওপাশটায় আঁটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত। তার থেকেই তো চারা গজিয়েছিল।

—প্রমাণ করতে পারবে? গাছটা যখন পাঁচিলের ওপারে, রাইটও ওদেরই।

—তাহলে ডালপালাগুলোও ও দিকে সরিয়ে নিয়ে যাক। সে লক্ষ্মীছাড়ারা এ দিক পানে ধেয়ে আসে কেন? আমাদের দিকে আম পড়লেও ওদের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে হবে এমন কোনও লেখাজোকা আছে নাকি?

—ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না। বাড়িতে কি কম আম আসে? রোজই তো বাজার থেকে...

—বাজারের আম, বাজারের আম। বাড়ির আম, বাড়ির আম। দুটোর স্বাদ কি এক হয়?

—তা হলে আর মুখ ভেটকে বসে আছ কেন? খিস্তি খেউড়গুলোও হজম করে নাও।

—নিচ্ছি তো। কাউকে কি শোনাতে গেছি? তুই-ই তো গায়ে পড়ে...

এই হল আমার মা। কোনও যুক্তির ধার ধারে না। যারা কুচ্ছিত ভাষায় অপমান করে তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে যেচে যেচে। গালাগালির মূল হোতা মণ্টুদার বউটা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করো, ওমনি মা ঝামরে উঠবে—আহা রে, কচি বয়সে স্বামী হারিয়েছে, শোকাতাপা মেয়েটার কথা গায়ে মাখতে আছে! বলতে বলতে আঁচলে চোখও মুছে নেবে টুক করে। আর দোতলার কোনও সুসংবাদে? মা তো একেবারে আহ্লাদে গদগদ। শুনেছিস ঋতু, ঝণ্টুর একটা কী ফুটফুটে নাতি হয়েছে! ইস্, সূর্যবাবু গীতাদি বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হতেন! গত অঘ্রানে ঝণ্টুদার বউ নিজে এসে মাকে বিয়ের নেমন্তন্ন করে গেল, মার তো আনন্দে পাগলপারা দশা। দুল দেবে, না আংটি, নাকি পিওর সিল্ক, ভেবে ভেবে কূল পায় না। টুকটুকির বিয়ের দিন দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে দোতলায় উঠে গেল মা। এ দিকে আমরা ভাইবোনরা তো কাঁটা হয়ে আছি, পাঁচ জনের সামনে মাকে না ছ্যার ছ্যার করে কিছু শুনিয়ে দেয় মণ্টুদার বউ। কিংবা মণ্টুদার ছেলেরা। অঘটন যদিও কিছু ঘটল না, প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে ফিরে মা জানাল তাকে নাকি বড়ই খাতির-যত্ন করেছে সবাই।

মাস তিনেকের মধ্যেই অবশ্য নমুনা মিলল খাতির-যত্নের। দোতলা থেকে মাছের আঁশ পড়ছে ঝুরঝুর, নেমে আসছে আনাজের খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট। সঙ্গে নোংরা স্যানিটারি ন্যাপকিনও। মার দৃষ্টি তো প্রায় গেছে, সেই ন্যাপকিন আবার আঙুলে তুলে প্রশ্ন করছে, এটা কী ফেলল দ্যাখো তো প্রমিতা! ওপরের বারান্দায় তখন যুবতী বউদের খিলখিল হাসি, যেন আচ্ছা জব্দ করেছে শ্বশুরবাড়ির ভাড়াটে বুড়িটাকে।

মানছি, আমরা কম ভাড়ায় থাকি। মামলার কারণে সে টাকাও জমা পড়ে রেণ্ট কন্ট্রোলে। আমাদের ওপর বাড়িওয়ালার রাগ থাকতেই পারে। তা বলে ওই স্তরের অসভ্যতা? এ পাড়ায় তো আরও অনেক পুরনো ভাড়াটে আছে, বাড়িওয়ালাকে তারাও কিছু পাঁচ দশ হাজার ঠেকায় না, আজ তারা বাড়ি ছাড়লে গৃহস্বামীরা কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবে। কিন্তু ভাড়াটেদের সঙ্গে এ ধরনের লাগাতার নোংরামি করে চলে কোন বাড়িওয়ালা? নেহাত জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে, নইলে মা বউদি ভাইঝিকে নিয়ে রমু তো কবেই উঠে যেত।

প্রমিতা চা বানাতে গেছে ভেতর বারান্দায়। গলা উঁচিয়ে ডাকল,—দিদি, একবারটি শুনে যাও।

পায়ে পায়ে কাছে গেলাম,—কী রে?

জানো তো পরশু দুপুরে ওপরে নগেন দত্ত এসেছিল।

সে আবার কে?

ওই যে গো, মোড়ের রাঘববাবুদের বাড়িটা ভেঙে যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে। প্রমিতা গলা নামাল,—লোকটা অনেকক্ষণ ছিল দোতলায়। নামার সময় আমাদের পোরশানটা টেরিয়ে টেরিয়ে খুব দেখছিল।

দক্ষিণ কলকাতার এ অঞ্চলটায় জমি ফ্ল্যাটের এখন বিস্তর দাম, প্রোমোটাররাও তাই পুরনো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেণ্ট বানানোর জন্য ছোঁকছোঁক করছে সর্বক্ষণ। এ বাড়ির ওপরও নজর পড়েছে তা হলে? স্বাভাবিক, এ বাড়িরও বয়স তো কম নয়। সূর্যজেঠার বাবা বাড়িটা বানিয়েছিলেন সেই উনিশশো আঠাশ সালে। আর আমার বাবা-জেঠারা ভাড়া নিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। যখন লোকজন দুদ্দাড়িয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। তার পর তো বাবা-জেঠাদের সংসার হল, সংসার বড় হল, চাকরিসূত্রে জেঠারা একে একে চলেও গেল অন্যত্র, একমাত্র বাবাই যা সপরিবারে রয়ে গেল পাকাপাকি। এর পর এ বাড়ি হয়তো মুছেও যাবে কালের নিয়মে।

প্রমিতা কাপে চা ঢেলেছে। চিনি নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল,—আমাদের ফ্লোর এরিয়া কত আছে গো দিদি? হাজার দেড়েক স্কোয়্যার ফিট হবে না?

—তা হবে।

—বাড়ি ভাঙা হলে সমপরিমাণ জায়গার ফ্ল্যাট আমরা পাব না? রাঘববাবুদের ভাড়াটে তো পাচ্ছে।

—দাঁড়া। আগে তোদের ওপরওয়ালা রাজি হোক। তাদের সঙ্গে দরে বনুক।

—বনবে গো বনবে। মোটা প্রণামি পেলে ওপরওয়ালাও গলে জল হয়ে যায়।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও কথাটা পাক খাচ্ছিল মাথায়। রাস্তায় নেমে এক বার ঘুরে দেখলাম বাড়িখানাকে। ইস্, কী জীর্ণ দশা! রঙের বালাই নেই-ই, চতুর্দিক থেকে প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। নিজেরাও সুরত্ ফেরাবে না, আমাদেরও হাত ছোঁয়াতে দেবে না। বছর দুয়েক আগে রমু ঘরগুলো চুনকাম করাল, তাই নিয়েও দোতলা থেকে যা খিস্তির ফোয়ারা ছুটেছে।

নাহ্ প্রোমোটারের হাতে গেলেই বেশ হয়। তখন ফ্ল্যাট তো একটা জুটবেই,

সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অশান্তির অবসান। তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও স্বস্তি পাই। নগেন না খগেন, তাকে বলে একটা ফ্ল্যাটকেই যদি দুটো করে নেওয়া যায়, একটাতে রমু থাকল, অন্যটায় তুলতুলিকে নিয়ে প্রমিতা। সমু মারা যাওয়ার পর রমুই সংসারটা দেখে, নিজে বিয়ে-থা করেনি, বউদি-ভাইঝির কোনও অযত্নই সে করে না। তবু পায়ের নীচে নিজের ফ্ল্যাটের শক্ত মাটি থাকলে প্রমিতাও বুঝি একটু বেশি নিশ্চিন্ত হয়।

হা হতোস্মি, কোথায় কী! পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখি প্রমিতার মুখ ভার, মা ফিকফিক হাসছে। সোফায় বসতে না বসতেই মাতাঠাকুরানির সে কী উচ্ছ্বাস,—অ্যাই জানিস তো, মন্টুর বউ এতদিনে একটা বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে।

ধন্দ মাখা মুখে বললাম,—কী রকম?

—এক বজ্জাত প্রোমোটার বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানানোর টোপ দিতে এসেছিল, তাকে ঘেঁটি ধরে বের করে দিয়েছে।

শুনে খুশি হব, না ব্যথিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মা ফের বলল,—তোরা তো শুধু বউটার নিন্দেমন্দই করিস, দ্যাখ একটা কত বড় প্রলোভন জয় করল।

—ও কথা বলবেন না মা। প্রমিতা ঝনঝন বেজে উঠেছে,—শুনিয়ে শুনিয়ে কী বলছিল কানে যায়নি আপনার?

প্রমিতা উত্তেজিত ভাবে বলল,—কী বলে চেল্লাচ্ছিল জানো? হারামজাদা ভাড়াটে ফোকটে ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে, এমন ডিলে আমি ইয়ে করে দিই। ভাবো দিদি, কেমন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার পলিসি! ঝন্টুদা-মন্টুদা দু তরফেই তো ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে, দোতলায় এখন না হোক আট-নটা প্রাণীর বাস। নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়। তবু তেএঁটেপনা যাবেনা। ভাড়াটেকে বাম্বু দেওয়া হচ্ছে, এতেই প্রাণে মলয় বইছে।

—তাতে তোমার এত জ্বালা ধরে কেন বাছা? মা ফুট কাটল, ওদের সুবিধে অসুবিধে ওরা বুঝবে, তোমায় ভাবতে হবে না।

ফোঁস ফোঁস মন্তব্য, টুকুস টুকুস টিপ্পনি চাপান উতোর শুরু হয়ে গেছে। হাওয়া গরম ক্রমশ। আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বেরিয়ে আজও এক বার ঘুরে দেখলাম বাড়িটাকে। আমার কুমারীবেলার ঘ্রাণমাখা বাড়িটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ভেবে বুঝি বা একটু স্মৃতিমেদুরই হয়ে পড়েছিলাম সে দিন, আজ মোটেই তেমনটা লাগছে না। বরং বিরক্তিই জাগছে যেন। মনে হচ্ছে ছিরিছাঁদহীন এক

বুড়ো গায়ে ছেঁড়াখোড়া আলখাল্লা চাপিয়ে মাড়ি বার করে ভেংচাচ্ছে আমাকে। তর্জনী নাচিয়ে বলছে, নেহি মিলেগা শান্তি, নেহি মিলেগা।

দিন আষ্টেক পর আবার গেলাম মায়ের ডেরায়। ফোনে মা এত্তেলা পাঠিয়েছিল, ইডলি বানাচ্ছি, খেয়ে যা। সে দিন উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, গৃহে অপার শান্তি বিরাজমান। শাশুড়ি-বধু দু'জনেই সুহাসিনীম্, সুমধুরভাষিণীম্। বাড়ি ভাঙাভাঙি তো দূরস্থান, দোতলার প্রসঙ্গই উঠল না। রমুও ফিরেছে চটপট, তুলতুলিরও টিউটোরিয়াল নেই, সকলে মিলে জমিয়ে আড্ডা মারলাম সারা সন্ধে।

সময় গড়াচ্ছে নিজের মনে। গোটা গ্রীষ্মকালটা কলকাতাবাসীদের এ বার তাপে ভাজা ভাজা করলেন সূর্যদেব। কপাল ভাল, মৌসুমি বায়ু বেশ জলদি জলদি পৌঁছে গেল। আষাঢ়ের গোড়াতেই বৃষ্টির কী ধুম! সারাটা দিন আকাশ পাঁশুটে বর্ণ, কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে মেঘবাহিনী, টিপটিপ ঝিরঝির ঝমঝম কত বিচিত্র ধারাই যে ঝরছে অবিরাম।

এ বারও বর্ষায় ও বাড়ির অবস্থা বেশ কাহিল। রেনপাইপ ভেঙে উঠোন বারান্দা জলে কাদায় থইথই, স্নানঘরের ফুটো চাল দিয়ে ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি ঢুকে পড়ছে, পাঁচিলের ওপারে গাছ আগাছা বেড়ে মশককুলের বংশবৃদ্ধি ঘটছে দ্রুত। আর রুটিন মাফিক ঝরে-পড়া পচা আবর্জনায় ঘরের আশপাশ তো ম ম করেই।

তা, রেনপাইপে তো হাত ছোঁয়ানোর অনুমতি নেই। ও পারের মশকনিধনও নিষিদ্ধ। বোধহয় ওপরওয়ালা আশায় আশায় আছে এ বার ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাবে, ম্যালেরিয়ায় টাঁসবে ভাড়াটের গুষ্টি। এ সবের মধ্যেই আমার নির্বিরোধী ভাইটি হঠাৎ একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসল। ঝটাক্‌সে বদলে ফেলল কলঘরের টিনের চালখানা। কত আর বৃষ্টিতে ভিজে চৌবাচ্চা থেকে গায়ে জল ঢালা যায়!

প্রথম এক-দু'দিন বাড়িওয়ালা চুপচাপ, তার পরই নতুন করোগেটেড টিনের আচ্ছাদনে ধাঁই ধপাধপ ইঁট। ছোটোখাটো ঢেলা নয়, আস্ত আস্ত থান ইঁট। নিয়ম করে পড়ছে রোজ, সন্ধে নামার পরে। হঠাৎই বুদুম করে একটা আওয়াজ হয়, তার পর ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য, কয়েক সেকেণ্ড পর দোতলার বারান্দায় চাপা খিলখিল হাসি। মা এক দিন নরম করে গলা উঠিয়েছিল, কেন বাবা ও রকম করছ? কষ্টের পয়সায় সারানো চালাটা ভেঙে যাবে যে। অমনি যুবককণ্ঠে ওপর থেকে হরিধ্বনি, বলো হরি, হরি বোল। বুড়িকে এ বার খাটে তোল।

রমু বেচারি নার্ভাস হয়ে পড়েছে রীতিমত। সে চিরকালই সাংসারিক ঝামেলা পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে চলতে চায়। ও বাড়ি যেতে সেই রমুর গলাতেই অন্য সুর,—আর তো পারা যায় না দিদি। এ বার একটা এস্‌পার-ওস্‌পার করতেই হয়।

—কী করবি? থানায় যাবি?

—দূর, দূর, দারোগাবাবুদের ডিম খাইয়ে কী হবে। ভাবছি দোতলার সব কটাকে এক দিন বাঁশপেটা করে আসব।

বুঝলাম উদাসীন রমু খেপেছে বিস্তর। শান্ত করার জন্য ঠাট্টা জুড়লাম,—তার পর লাল গামছায় মুখ ঢেকে হাতকড়া পরে কোর্টে উঠবি, তাই তো?

—কপালে বোধহয় সেটাই নাচছে। জানিস, কাল তুলতুলিটা এক চুলের জন্য বেঁচে গেছে। উঠোনে কী জন্যে যেন নেমেছিল, ওমনি ছাদ থেকে মিসাইলের মতো একখানা ফাঁকা মদের বোতল। একটা টুকরো যদি ছিটকে এসে বিঁধে যেত...

—আমরা তো সন্ধের পর কলতলা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। প্রমিতা বলে উঠল,—অমূল্য বালতি করে জল তুলে রাখে, ভেতর বারান্দার ছোট বাথরুমটাতেই...

—হুম। বড় একটা শ্বাস টেনে খানিকটা হাওয়া ভরে নিলাম বুকে। মাথা নেড়ে বললাম,—কিন্তু এটা তো কোনও পার্মানেন্ট সলিউশান নয়।

—সমাধানের তো একটাই রাস্তা। রমুর স্বর গুমগুমে,—সূর্য চাটুজ্যের শয়তান নাতিগুলোরই জয় হোক। আমরা মানে মানে কেটে পড়ি।

—পালাবি?

—উপায় কী? টিনের চালটা ভেঙে গেলেই যে ওরা থামবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে? প্লাস রোজ রোজ খ্যাচোর খ্যাচোর, টেনশান...বাড়ি ফিরলেই এই কমপ্লেন, ওই কমপ্লেন...। আমি কাজকর্ম করব, না থানাপুলিশ করে বেড়াব? রমু মাথা ঝাঁকাচ্ছে,—বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে দিতে পারছে না বলে আমাদের ওপর আক্রোশ আরও বাড়ছে। যত রকমভাবে পারে এখন হ্যারাস করবে। তাই বরং সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, বাইপাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেলি। লোন-টোন নিয়ে হোক, যে করে হোক। তারপর পজেশান পেলে চলে যাব।

—উঠে যাব আমরা? বাড়ি ছেড়ে? বহু ক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকা মা হঠাৎই প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে,—কেন যাব?

—ওরা আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না, তাই।

—ওরা চাইলেই চলে যেতে হবে? কে ওরা? ওরা কে? মার গলা আচমকা চড়ে গেল,—কদ্দিন আছে ওরা এই বাড়িতে? ছোঁড়াগুলো তো এই সে দিন জন্মাল! ওদের বউগুলোই বা কত দিন এসেছে, অ্যাঁ? তিন বছর? চার বছর? পাঁচ বছর? আমি আছি পাক্কা ঊনষাট বছর। সেই বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক। ঝণ্টুর-মণ্টুর বউরা যত দিন এ বাড়িতে আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি দিন।

—আশ্চর্য, এ যে কমলাকান্তের মতো যুক্তি। দুধ আমি খেয়েছি, অতএব গরুও আমার। রমু ঠোঁট বেঁকাল,—বি প্র্যাকটিকাল মা। ঊনষাট বছর বসবাস করলেই বাড়ি ভাড়াটের হয়ে যায় না।

—আলবাত হয়। লক্ষ বার হয়। এটাই তো আমার ভিটেমাটি। এ বাড়িতেই বউ হয়ে আমি এই পরিবারে প্রথম পা রেখেছিলাম, এখানেই আমার ছেলেমেয়ে হয়েছে, এখানেই এত কাল সংসার করলাম, এ বাড়িতেই তোর বাবা মরেছে, আমার সমু মরেছে...

মার গলা মাঝপথেই আটকে গেল। স্বরযন্ত্র স্তব্ধ, কিন্তু কণ্ঠনালীর ওঠানামা চলছেই। ক্ষীণ হয়ে আসা দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জল।

এ কি শুধুই অশ্রু? নাকি ঊনষাট বছর ধরে এ বাড়ির একতলার ভিতে ইঁট-কাঠে কড়ি-বরগার জানলা-দরজায় চারিয়ে যাওয়া অদৃশ্য এক শিকড়ের রস? বুঝতে পারছিলাম না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মার কথাগুলো হয়তো নেহাতই হাস্যকর। নিছকই এক বৃদ্ধার প্রলাপ। তবু যে কেন গলার কাছে একটা ডেলা জমাট বাঁধে।

নাহ, শিকড়টাকে এখন উপড়ে ফেলা অসম্ভব। মণ্টুদার ছেলেরা বোমা মেরেও পারবে না।

দূরের মানুষ

আজ আবার ভোর না হতে কান্নায় পেয়েছে বেস্পতিকে। ফি বারই এক ব্যাপার। শ্রীধর যতক্ষণ না পথে বেরোয় একটানা সুর তুলে কেঁদে যায়। আরেক পত্তন হয় সে ফিরলে পর। দেওয়ালে কপাল ঠোকে। শাপমন্যি করে নিজের ভাগ্যকে। কচিকাচাগুলোকে বেধড়ক পেটায়।

সান্‌কির পান্তাকটা শেষ করে আড়চোখে বউকে দেখল শ্রীধর। আদুড় গায়ে আলটপ্‌কা ঝুলছে ছেঁড়া শাড়ি। শুকনো বুকের চামড়ায় গুঁতো মারছে কোলেরটা। আজকাল আর কান্নার সময় গাল ভেজে না বেস্পতির। বটফল চোখদুটো গোটা ভিটে জুড়ে শুধু আছাড়ি পিছাড়ি খায়। শ্রীধরের মনে হল কেঁদে কেঁদে বেস্পতির বুকটা বুঝি আরও শুকিয়ে গেছে। আটফাটা চামড়া শুখাদিনের খরামাটি। ভেতরে এতটুকু রস নেই। বড় মায়া জাগে। হাজার হোক মায়ের প্রাণ। প্রথম কদিন তার বুকটাও কি কম কেঁদেছিল। বাপ মা হওয়ার শতেক জ্বালা। দিনরাত মন জুড়ে সে কি দমবাঁধা কষ্ট। এখন অনেক সামলে গেছে। কম তো ছোটাছুটি হল না। এখান, সেখান, থানা, পুলিশ কত কি। ভাগ্যে কলকাতার বাবুগুলো সব পাশে পাশে ছিল। কি যে করত তা না হলে। গেঁয়ো মানুষ শহরগাঙ্‌এ হাবুডুবু খেয়ে মরত। যে যেমন বলেছে করে গেছে। চোখ বুজে কানার মত হেঁটে চলা যেন। তবু কোনো তল পাওয়া গেল না। শহরের মানুষগুলো যেন কেমন ধারার। তাদের কথার আগা মাথা বোঝা ভার। কাল আবার যুগল আরেক শলা দিয়ে গেল। কেস নাকি চাপা পড়ে গেছে। শুনে প্রথমটা দম মেরে গিয়েছিল সে,—তবে যে পুলুশ বলল কেস্‌ কোঁটে পেইঠে দেছে?

যুগল একচোট হাসল এ-কথায়,—তুমি খুড়ো বড় সাদা। পুলুশরে পয়সা দে বাবুরা কেস্‌ চেপে দেছে। শেখরদা বলতে ছেল গুণে পাঁচটি হাজার থানায়

জোমা দেছে কর্তাবাবু।

শ্রীধরের বুক ধড়ফড় করে উঠেছিল,—ভাদুরির তবে কি হবে?

—তারেও ছেড়ে দেবে। কাল সুধু তোমাকে গে এট্টা দোরখাস্ত দিতি হবে। তারপর আরও এক হপ্তা। ব্যস্।

শ্রীধর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি কোনও। নতুন বিপদের আশঙ্কায় ঢিপিস ঢিপিস ঢেঁকি পড়ছিল বুকে।

এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়েছিল শ্রীধর,—ভাবনার কিচু নেই গো খুড়ো। শেখরদারা সব বেবস্তা করে দেছে। তারা যা নেছে, তোমারেও তা দিতি এখন আজী কর্তাবাবু। পুরো হাজার। তোমারও তো কম হয়রানি গেল নাকো।

কাল থেকে সব কিছু যেমন গুলিয়ে যাচ্ছে শ্রীধরের। হাজার টাকা শব্দটাতেই বড় বেঁহুশকরা গন্ধ। জন্মে কোনদিন অত টাকা চোখে দেখেনি। পাঁচ কুড়িতে শ' হলে হাজার ক' কুড়িতে? তার থেকে অবশ্য দুশো দিতে হবে যুগলকে। নিক্ গে যাক্। সেও কম করে নি কদিন। চালাক চতুর ছেলে। কলকাতার আটঘাট সব নখের ডগায়। ভাদুরিকে পেয়ে গেলে সোজা কুঁড়ে ভাতারে ফিরবে শ্রীধর। টাকার জোর বড় জোর। সে জোরে তাদের ছেলের হাজতবাস যদি আটকাতে পারে, ভাদুরির মাথার কলঙ্ক কি মুছবে না?

দাওয়া টপকে উঠোনে নামল শ্রীধর। বেস্পতির গলা এখন একটু নেমেছে। গলার বাঁশ কাঁপিয়ে উঁ উঁ উঁ শব্দ উঠে চলেছে শুধু। শ্রীধর বুকের কাশ ঝেড়ে নিল,—আর কানিস নি। আজ একটা কিচু হয়ে যাবে মনে হয়।

লাল চোখ তুলে তাকাল বেস্পতি, —কি আর হবে? কি হতি আর বাকি আছে?

বউকে টাকার কথা বলা হয় নি এখনও। বলে লাভও নেই। মেয়েছেলের বুদ্ধি দেরিতে খোলে। না বুঝেই না হক খানিক চেঁচামিচি করে নেবে।

শ্রীধর বউএর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল,—চেষ্টা তো করতিচি রে। তুই এবার মনটারে বাঁদ।

—তুমার জন্যি। এ সপ্ই হইয়েচে তুমার জন্যি। তুমি বাপ লয়, পাষাণ।

পোড়া ঘায়ে নুনের ছিটে। শ্রীধর নিমেষে মেজাজ হারাল, —আমি একা তারে পাইঠেছিলম? সব দুষ এখুন আমার লয়?

—না তো কি? ত্যাখন খুপ বইলেছিলে শ'রে গেলি মেয়ে খেইয়ে পরি থাকবে। মাস মাস কটা ট্যাকার জন্যি কত নোলা।

—সে ট্যাকা কার গব্বে গ্যাচে অ্যাঁ? তুদের না আমার?

—আমি উসব কিচু ঝানি নি। বেস্পতি গলা ফাটাল, —তুমি আমার ভাদুরিরে ফিইরে এনি দাও। আমি আর সইতে পারতিচি নি।

শ্রীধর অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। মেয়েছেলেদের কত সুবিধে। যেই বুকে কষ্ট জমল গল্‌গল্‌ উগরে দিল বাইরে। বেটাছেলেরা যদি অমন গলা ছেড়ে কাঁদতে পারত। ওই মেয়ে লোকটাকে যদি হৃদয় ফাটিয়ে দেখানো যেত। কটা দিন কি হন্যে হয়ে না ঘুরে বেড়িয়েছে মানুষের দোরে দোরে। বাবুরা না হলে গলে যায়! কলকাতার সেই বাবুগুলো বড্ড ভাল। যেমন বিরাট মন, তেমনি বিবেক বিবেচনা। ছোড়দাবাবুর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে ভাদুরি ছিটকে এসেছিল রাস্তায়, ওই বাবুরা সব তখন রোয়াকে বসে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে পথের ধারে ভিরমি খেয়ে পড়তে বাবুরাই তাকে দিয়ে আসে হাসপাতালে। থানায় গিয়ে নালিশ জানায়।

শ্রীধর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। অত বড় মেয়েটাকে কাছছাড়া করতে তারও প্রথমটা মন চায় নি। নিজের বলতে জমি জিরেৎ কিছু নেই। পরের জমিতে জন খাটা। তাও নোনামাটির বুকে একবারের বেশি ফসল উঠতে চায় না। চাষের মরশুম বলতে গেলে সাকুল্যে তিন থেকে চার মাস। তারপর বছর ভোর খালি কাজের খোঁজে দৌড়ে বেড়ানো। আজ ক্যানিং তো কাল সোনারপুর। কখনও সেই গাঙ্‌পার। দিন দিন সংসারের পেট বেড়েই চলেছে। নোনাদেশে মাটির তবু বিশ্রাম আছে, মেয়েছেলের শরীরের বিরাম নেই কোনও। বিয়ে করা অবধি বউ শুধু বিইয়েই চলেছে। শরীরে বল নেই। হাড়ে মাস নেই। তাই নিয়েই কোলেরটাকে ধরলে আটটা ছানাছানির জন্ম দিয়েছে বেস্পতি। দুটো জন্মে মরেছে। একটা পেটে। আরেকটা এই গত সনে। দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেছিল। একদিনের ভেদবমিতেই চোখ উল্টোল। লোভ সামলাতে না পেরে ক্যানিং-এর বাজার থেকে খুদ কিনে এনেছিল চারটি। তাই খেয়ে ঘরশুদ্ধ লোকের পেট আলগা। শেষে একটাকে শুধু নিয়ে রেহাই দিল ভগবান। ভাদুরিকে তার পরেই বালীগঞ্জে রেখে আসে সে আর যুগল। আগের মাসকাবারে গিয়েও দেখে এসেছে। বাবুদের বাড়ির জল পেয়ে মেয়ে দিব্যি ডগডগ্‌ করছে। কে জানত হুট করে এই বিপদ ভেঙে পড়বে মাথায়। যুগলের কতা শুনে বড় আশা করে ভাদুরিকে কাজে পাঠিয়েছিল।

যুগল বলেছিল, —এখানে শুকিয়ে মরতিচে। কলকেতায় কাজে দে দাও।

শ্রীধর তবু ভাবনা চিন্তা করে। বেস্পতির মন খুঁতখুঁত। মেয়ে দিন দিন ঝাড়া দিয়ে উঠছে। আজ বাদে কাল বর খুঁজতে হবে।

যুগল ছাড়ে না, —বাবুদের বাড়ি আমি কোথা দে এসেচি একটা ডাগরপানা মেয়ে ঠিক এনি দুব। তুমরা অত ভাবতিচ ক্যানো? মেয়ে তুমাদের বানে ভাসবে না। ভদ্দর নোকদের ঘরে কাজ কাম করবে। এক্কেরে ঘরের মেয়ের মতো থাকা। দুবেলা ভরপেট খাওয়া পাবে। যেমন তেমন শাক পান্তা মুড়ি নয়। একদোম বাবুদের খাওয়া। সরু চালির ভাত ডাল, মাছ, মাংস। এব্‌লা, ওব্‌লা টিপিন। তা বাদে জামা, কাপড়, তেল সাবান আর মাস গেলি অতগুলোন কাঁচা ট্যাকা।

শুনে শুনে একসময় লোভ ধরে গেল। যুগলকে দোষ দিয়ে কি লাভ। এমন হবে সেও কি ভাবতে পেরেছিল?

ঢোল কল্‌মীর ঝোপের ধারে সাপুইদের পুকুর। শ্রীধর থমকে দাঁড়াল। এই পুকুরে একবার ডুবে মরছিল ভাদুরি। কত বা বয়স তখন! ন খোকাটার চেয়েও ছোট। দু-মানুষ জলে মেয়ে ডুবছে ভাসছে। শ্রীধর একশ্বাসে সাঁতরে গিয়েছিল মাঝপুকুর। অপর শ্বাসে মেয়ে কাঁধে ডাঙায়। ঘরে ফিরেও মেয়ে খালি খাবি খায়। তা, দেখে কুনোঠাকুমা বলেছিল, —এই তো সপে শুরু রে ছানি। মেয়েনোক হইয়ে জন্মেচিস। জেবনভোর কত খাবি খেতে হবে।

ঠাকুমা আজ বেঁচে থাকলে কি বলতো কে জানে। শ্রীধর চুপচাপ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যুগলের এখনও দেখা নেই। আঁধার ঝেঁটিয়ে দিন ফর্সা হচ্ছে ক্রমশ। জলের কোলে এইমাত্র ঝাঁপ কাটল সাপুইদের হাঁসজোড়া। সজনে ডালে ফিঙের নাচন। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু শ্রীধরের বুকেই বিষতীর হেনেছে কেউ। এ তীর তুলে ফেলা যাবে না। জীবন জুড়ে ছড়াতে থাকবে বিষ।

শ্রীধরের বুক নিংড়ানো নিশ্বাস ভেসে গেল সাঁপুইদের শীতল জলে। ঘাস আগাছা মাড়িয়ে মেঠো রাস্তায় উঠে এল সে। ওই আসছে যুগল। সবুজ প্যান্ট আর ফুলতোলা গেঞ্জি আলোর বুকে ফুটে উঠল। যুগল সঙ্গে থাকলে বুকের বল অনেক বাড়ে। হাজার হোক এখন তার কলকাতায় বাস। মাসের মধ্যে পঁচিশদিন সেখানেই থাকে।

টিউবকলের গা বরাবর এগিয়ে গেল শ্রীধর, —ও জামাই, ছটার গাড়ি ধরতি পারব তো?

যুগল কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘড়ি দেখল, —খুব পারব। চপ্পর চপ্পর হাঁটো দিনি।

কুঁড়ে ভাতার থেকে চম্পাহাটি হাঁটাপথে আধঘন্টা। রাস্তা ছেড়ে তারা আলপথে নামল। দুধারের বিস্তীর্ণ মাটির বুকে লাঙল পড়েছে। বসুমতীর দেহ

ওলোটপালোট। দাসেদের জমিটা এবার শ্রীধরের চষার কথা ছিল।

আগে আগে হেঁটে চলেছে যুগল। কেয়ারি করা চুল ভোরের বাতাস পেয়ে ফুরফুর নাচছে। শ্রীধর পিছু ডাকল, —ও জামাই, আমার বড় ডর নাগতিচে। শেষে তারা গোল বাধাবে নি তো?

যুগল ঘাড় দোলাল, —আমি আচি না? সব কোথা পাকা করে তবে ছেড়িচি। দুনিয়া শুদ্ধ নোক ক্ষীর মারবে আর আমরা বসি আঙুল চুষব? মেয়েটা কাদের এ্যাঁ?

—অত ট্যাকা তারা দেবে বলেচে?

—সহজে কি দিতি চায় গো। শেখরদারা পয্যন্ত আ কাড়তি চায় না। শেষে আমি গে জোর হল্লা নাইগে দিলাম।

—তারা মানলো?

—মানবে না মানে? ছোটনোকদের চেল্লামিল্লিকে ভদ্দর নোকরা খুব ভয় পায় খুড়ো। শেখরদা বলল, ডাঁরা দেকি কি করতি পারি। আমি বললাম, মেয়ে যেকালে আমাদের, ক্ষেতিপূরণটা ভাল দিতি হবে। শেখরদা শেষকালে গে আজী করালে কত্তাকে। য্যাতোই হোক ও মেয়ে তো আমাদেরই ঘরে এনি তুলতি হবে। কি বলো?

শ্রীধর কোনও কথা বলল না।

যুগল আবার বলল, —মেয়েনোকের কলঙ্ক যে সে কোথা নয়। কাটা শরীলে সিলাই-এর দাগ যেমন, মেয়েছেলের কলঙ্ক তেমনি।

শ্রীধর এবারও কোনও কথা বলল না।

যুগল প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরাল,—কিচু বলচো নি যে বড়?

—কি আর বলি। শ্রীধর ফোঁস্ করে শ্বাস ফেলল, —ভাবতিচি শেষে ভাদুরি আমার ছাড়া পেলি হয়।

—পাবে গো পাবে। তারে একে দে পুলুশের কি নাভ?

—মিছিমিছি তবে এ্যাৎদিন তারে এট্‌কে আকলো ক্যানো? বাবুদের ছেলে তো পরদিনই ছাড়া পেইয়ে গেল।

যুগল হাসল, —হাজতে তারে আকেনি গো খুড়ো। সে আচে উদ্দারাশ্যমে। কত মেয়েনোক সেখেনে থাকে জানো? এপ্ কেস হলি পর সবাইরে ওখেনে আকতি হয়। এই হল গরমিন্টের আইন। ডাক্তার দেখে....পুলুশ দেখে...জজে দেখে...

শ্রীধরের গলা কেঁপে গেল,—ও মেয়ে নে আমি এখুন কি করি বলো

দিনি। বেবাক গেরামের নোক সব্ বিত্তান্ত জেনে গেচে। ওরে যে কি করে পার করি!

—অত ভেঙে পোড়ো নি তো। ট্যাকা পয়সা আসতিচে। সব ঠিক হইয়ে যাবে।

শ্রীধর হু হু করে কেঁদে ফেলল, —ঠিকই যতি হইয়ে যাবে এত কাণ্ডর কি দরকার ছেলো? গোড়াতেই সপ্ মিইটে নিতি পারত। মেয়েটারও বদনাম হতু নি। আম্‌গারও মান থাকত।

—সবই বড়নোকদের খেলা খুড়ো। ভদ্দরনোকদের খেয়াল। যুগল একরাশ তামাকের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিল ফাঁকা বাদায়,—নাও। চলতি চলতি একটু দম দে নাও দিকি। অতগুলো ট্যাকা নি আবার ফিরতি হবে।

হলুদরঙা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরেছে যুগল। সেটা ধরার আগে শ্রীধরের থরথর হাত যুগলের কব্‌জি আঁকড়ে ধরল। যুগলই এখন তার সব ভরসা।

দুই

লেবুপাতারং ঘরের চারধারে মাটিরং আরাম কেদারা। গোল টেবিলে বাহারী ছাইদান। নক্সা করা ফুল রাখার গেলাস। লম্বা লম্বা সিল্কের পর্দা টিয়ার ঝাঁক হয়ে উড়ছে জানলায়। দেওয়াল জুড়ে কোন্ এক অচিন দেশের ছবি। এ সবই অনেকবার দেখা। তবু ঘরটাকে আজ বড় অচেনা লাগল শ্রীধরের। কর্তাবাবু আর বড়ছেলের সঙ্গে গিন্নিমাও এসে বসেছে ঘরে। গিন্নিমাকে দেখে ইস্তক বুকে যেন লাঙল চলছে। লালপুরু পশমের মাদুরে পা গুটিয়ে বসল শ্রীধর।

গিন্নিমা মানুষটা বড় ভাল। তার ছেলে হয়ে ছোট্‌দাদাবাবু ও কীর্তি করল কেন, কে জানে। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে আসে শ্রীধর, কত আদর যত্ন করেছিল মা। আলুর তরকারির সঙ্গে গরম পরোটা খাইয়েছিল। তারপর কাপভর্তি চা। যখনই আসে এটা সেটা ভালমন্দ খেতে দেয়। কি সব স্বাদ সে খাবারের। বেস্পতি কোনওদিন অমন রাঁধতে পারবে না। শুধু কি রান্না? আগে আগে গিন্নিমার ঘরবাড়ি দেখে বাক্যি ফুটত না মুখে। কি মস্ত কোঠা বাড়ি। তেমন সব বড় বড় ঘর। বড়লোকরা কত কায়দায় ঘর সাজাতে জানে। ভগবানের স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তা আছে বাবুদের এইসব দালানবাড়িতে। দেবদেবীরা এখানে মানুষ সেজে বাস করে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী সব এক

ঠাঁয়ে। দেখে দেখে আশ মিটত না শ্রীধরের। চুরি করে বাবুদের আসবাবে হাত বোলাত। এমন একটা স্বর্গধামে তার গরীব মেয়ে ঠাঁই পেয়েছে ভাবতে বুক চলকে ওঠে। সে ভারি জ্বলজ্বল চোখে মেয়ের হাত চেপে ধরত,—ও মা, ভাল আছিস তো?

গিন্নিমা মধুর হাসত, —ও মেয়ে এখন আমার হয়ে গেছে শ্রীধর।

লজ্জাবতীর পাতার মতো চোখ বুজত ভাদুরি। গোলাপ ছাপ শাড়ি আর লাল টুকটুক ব্লাউজে যেন রাজরানী। গিন্নিমা সরে গেলে শ্রীধর লোভী চোখে দেখত চারদিক, —গিন্নিমার কাচ থিকি তোর মার জন্যি এট্টা পুরোনো কাপড় চেয়ে দে না। তার পরণেরটা এক্কেরে কুটিকুটি।

কখনও বলত, —বৌদিদির ছেলের ছোট জামা নেই রে ভাদুরি? তোর কচি ভাইটার বুঝি ঠিক ঠিক হয়।'

তা দিয়েছিল গিন্নিমা। একবার বুঝি মুখ ফোটাতেই পুরোনো ডুরে শাড়ি, খান দুচার জামা আর কচির জন্য প্যান্ট। মানুষ নয়, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আর বৌদিদি হল সরস্বতী ঠাকুর। যেমন অপরূপ রূপ, তেমন বুদ্ধির তেজ। ঘর ফিরে সাতকাহন করে বেস্পতির কাছে গল্প করত শ্রীধর।

বেস্পতি রঙ্গ করে বলত, —খালি দিকি বৌদিদি আর গিন্নিমার কোথা। বাবুরা কেমন বলো দিনি।

বাবুদের সঙ্গে কোনওদিন তেমন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। সে পৌঁছবার আগে কর্তাবাবু রথ হাঁকিয়ে বেরিয়ে যেত। সঙ্গে বড়ছেলে। যুগল বলত, —তাদের কত ট্যাকা...লোহা লক্কড় যন্ত্রপাতি আরও যেন কিসের বেব্‌সা।

শ্রীধর আড়চোখে বাবুদের দেখে নিল। গোমড়া মুখে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে কর্তাবাবু। গিন্নিমা আর বড়দাবাবু নিজেদের মনে ফিস্‌ফিস্ কথা বলছে। দাদাবাবুর ভুরু নাকের কাছে জড়ো, গিন্নিমার মুখ থম্‌থম্।

যুগল নড়ে বসল, —এজ্ঞে, যে জন্যি এসছিলাম—

—বলে ফেলো। কর্তাবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলল না।

শ্রীধরের অস্থির বুক টানটান হল। বাবুরা মোটে কথাই বলতে চায় না। তবে যে শ্রীধর বলছিল তারা খুব ঘাবড়ে আছে! গেলেই টাকা বার করে দেবে।

যুগল আবার গলা ঝাড়ল, —এজ্ঞে আপনি এসতে বলেছিলেন—

বাবুর চশমাপরা চোখের ধার কি! শ্রীধরের বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেল। যুগলের মুখ শুকিয়ে গেছে। চতুর ছেলে ঘাবড়ে মাবড়ে একসা।

—দেখো, একটা সাফ্ কথা বলি, গিন্নিমা বাবুর পাশে এসে বসল, —

আমার ছেলে একটা অন্যায় করে ফেলেছে বটে তবে তোমাদের মেয়েরও কম দোষ ছিল না।

শ্রীধরের বলতে ইচ্ছে হল, এ কথা আমায় কেন আগে বলোনি মা। জুতিয়ে মেয়ের মুখ ছিঁড়তাম। কিছুই বলতে পারল না। হেঁট মাথা হেঁট হল আরও।

—সাজগোজের বাহার বাড়ছিল দিন দিন। আজ টিপ দাও, কাল ফিতে—

শ্রীধর আরও জড়োসড়ো হল।

—ভেবেছিলাম বাচ্চা মেয়ে একটু শখ-আহ্লাদ করছে। সে আমার ছোটছেলের মাথা ঘোরানোর জন্য তা কি ছাই বুঝেছি? দূর করে দিতাম না তাহলে।

চোরের মায়ের বড় গলা। যুগল ফস্ করে বলে ফেলল, —সব ঠিক কোথা মা। তবে তুমার ছেলে একা পেইয়ে তারে এপ্ করেচে এতো ঠিক।

—তুমি চুপ করো। বড়দাবাবু হুড়মুড় এগিয়ে গেল, —আমরা শুধু ভাদুরির বাপের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

যুগল দমে গেল। একবুক সাহস কোথায় উধাও। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল কর্তাবাবু, —বাজে কথা থাক্। যা হবার হয়ে গেছে। তবে পাঁচশো টাকার বেশি আমি তোমাদের দিতে পারব না। রাজী থাকলে বলো।

এরকম তো কথা ছিল না। শ্রীধর যুগলের চোখে চোখ ফেলতে চাইল। আসার পথে সেই বাবুদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তারাও টাকার ব্যাপারে তেমন গা দেখায় নি। উদাস মুখে বলেছিল, —ও বাড়ির কাজ সেরে আমাদের কাছে এসো। দরখাস্ত লিখে দেব। থানায় আজ জমা দিলে সাতদিন পর মেয়ে ফেরৎ পাবে।

শ্রীধরের গলায় কান্না জমাট বাঁধল। অনেক চেষ্টায় কথা বলল সে,— আপনেদের মা কত আচে। আমি বড় গরীব—

—তার জন্য আমরা কি করতে পারি? ছেলেটার কাঁচা বয়স, ঝোঁকের মাথায় ভুল করে ফেলেছে। তার জন্য কম হয়রানি করোনি তোমরা। তাকে হাজত পর্যন্ত ঘুরিয়ে ছেড়েছো। গিন্নিমা হঠাৎ ঝর্ ঝর্ কেঁদে ফেলল, —ছেলেটা আমার সেই থেকে মনমরা হয়ে আছে। ভাল করে খায় না। দায় না। শখ করে কী যে কালসাপ পুষেছিলাম ঘরে।

বড়ছেলে জড়িয়ে ধরল মাকে। স্বামী হাত চেপে সান্ত্বনা দিল।

দেখে মনে হয় বাবুদের ছেলে নয়, অপরাধটা বুঝি শ্রীধররাই করেছে।

কিছু পর কর্তাবাবু উঠে দাঁড়াল,—গোরুর গাড়ি খানায় পড়লে ব্যাঙও এসে লাথি মেরে যায়। আমাদের এখন সেই দশা। দে খোকন, ওদের পাঁচশো টাকা দিয়ে দে।

বড় দাদাবাবু পকেট থেকে পাঁচখানা নোট বার করল, —শোন, আর কোনওদিন এ বাড়ির ছায়া মাড়াবে না। আমাদের মান সম্মান বলে একটা কথা আছে বুঝেছ। তোমাদের জন্য আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শী কারুর কাছে মুখ দেখানো দায়। যত সব উট্‌কো আপদ।

শেষ কথাটা নিজের মনে বলা। তবু শ্রীধরের বুকে চাবুক পড়ল। বুকের ক্ষত জুড়ে চিনচিন যন্ত্রণা। সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে সেও সোজা হল হঠাৎ।

—ঠিক কোতা বলেচো বাবু। আপনেরা সব সোম্মানি মানুষ। আপনেদের মানে লাগে। যে মেয়ের এজ্জোৎ গেছে তার বাপের আর মান কি?

বাবু কটমট করে তাকাল।

গিন্নিমা ফুঁসে উঠল, —ভিখিরির আবার বড় বড় কথা। এই সেদিনও এসে হাত পেতেছ, আজ বড় মান দেখায়। ছোটলোকদের যদি এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে।

শ্রীধর খুব ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল। মাথা টগবগ ফুটছে। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। বহুকাল পর বড় ঠান্ডা মাথায় বলল, —হ্যাঁ মা ঠাকরুণ। আমরা ভিখিরির দল। কত কিচু আপনি দিয়েচো আমারে। টাকা, পয়সা, জামা কাপড়। আর বেশি চাইব নি। শুদ্ধু আমার মেইয়েটারে ঝেমন দিছিলাম ফেরৎ দে দাও।

তিন

পথ চলতে বেদম কষ্ট হচ্ছিল শ্রীধরের। থানার কাজ শেষ হলে ঘরে ফেরা যাবে। মাথার ওপর হিংস্র সূর্য। পায়ের তলায় পীচগলা রাস্তা। উদোম পায়ে কামড় বসাচ্ছে গরম আলকাতরা। নাকে মুখে হল্কা হাওয়ার ঝাপট। নাক বেয়ে বুক। বুক বেয়ে হৃৎপিণ্ডের আরও গভীরে ছড়িয়ে গেল গরম বাতাস।

থানার কাছে এসে হুড়হুড় বমি করে ফেলল শ্রীধর।

যুগল পিঠে হাত বোলাল, —কি হল খুড়ো? কি কষ্ট হতিচে?

—কিচু না। শ্রীধর জোরে জোরে দম নিল, —কুথায় যেতি হবে খর খর চল্।

বারকয়েক এসে এসে থানার টেবিল চেয়ার সব মুখস্থ। দোরে দাঁড়ানো

সেপাইটাকে যুগল সেলাম দিল। শ্রীধর টের পেল আজ তার থানায় ঢুকতে এতটুকু বুক কাঁপছে না। বাবুদের বাড়ির লোকেরা যেন তার কানা চোখ ফুটিয়ে দিল।

ডিউটি দারোগা ভুরু কোঁচকাল, —কি ব্যাপার?

বাবু দোরখাস্তটা দিতি এসছিলাম। সেই যে বাবু ভাদুরি মণ্ডল

দারোগার মুখে হাসি ছড়াল, —ও সেই রেপ কেস? তা গেছিলি বাবুদের বাড়ি?

যুগল হাত জোড় করল, —এজ্ঞে।

—কতোয় রফা হল?

যুগল শ্রীধরকে দেখে নিল। শ্রীধরের নির্জীব শরীরে আবার বিশ্রী কাঁপন। দু হাতে মাথা খামচে ধরল সে।

যুগল ঘাড় নামাল, —তেনারা আম্‌গার কোথা শুনলই না বাবু। পাঁচ কোথা বলে দেল।

—মালকড়ি ছেড়েছে কিছু?

—এজ্ঞে পাঁচশো দেছে।

ডিউটি দারোগা হো হো শব্দে হেসে উঠল,—মন্দ কি। ভালই বাগিয়েছিস। তোর মেয়ের দাম তো বেড়ে গেল রে অ্যাঁ? এক কাজেই পাঁচশো।

ফুটন্ত সর্ষের তেল কানের পর্দায় গলে পড়ছে যেন। শ্রীধর আর দাঁড়াল না। চুপচাপ বেরিয়ে এল বাইরে। ডিউটিবাবু তখনও বলছে, —আর কোনও মেয়ে নেই তোদের? সেগুলোকেও এবার কাজে যুতে দে। বিঘেটাক জমি তো হয়ে যাবে।

শ্রীধর দাঁড়িয়ে আছে। থানা থেকে নেমে যুগল পায়ে পায়ে এগিয়ে এল,

—কিচু মনে নিও নি গো খুড়ো। পুলুশ দারোগাদের ধারাই এরম।

সারাদিন পর শ্রীধর এই প্রথম হাসল। ম্লান, দীর্ঘ হাসি, —কিচুই মনে আকিনি গো জামাই। সপ ভুইলে গেচি। শুদু ভাবতেচি বেস্পতিরে এখুন মুক দেখাই কি করে? ছি ছি, কি হল বলো দিনি।

—আমার কি দোষ বলো....

—নাঃ। দুষ তুমারও নয়। আমারও নয়। আসল ভুল হইয়েচে অন্য জাইগায়। ওদের সঙ্গি তোফাৎটা ঠিক আমার মাথায় ছেলো না। ফলে মেয়েও গেল। নিজির মানও গেল।

—তা ঠিক। যুগল মাথা নাড়ল, —গরীব বড়নোক তোফাৎ অনেক।

—গরীব বড়নোকের বেপার নয় জামাই। এ হল গে মানুষে মানুষে তোফাৎ। হ্যাঃ। আমরা কি আর মানুষ গো? পুরো মানুষ নয় বোধহয়।

যুগল ফ্যাল ফ্যাল তাকাল। শ্রীধরের গলা ভারি অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যেন এ পৃথিবী নয়, অন্য পৃথিবী থেকে কথা বলছে খুড়ো।

—কোথাটা ঠিক বলিচি কি না ঠাণ্ডা মাথায় ভেবি দেখো। আমি চললাম। তিনটের গাড়ি ধরতিই হবে। তোমার খুড়ি বইসে আচে।

খেঁটো ধুতি পরা দূরের মানুষটা কলকাতার জঙ্গল মাড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে ফিরে যাচ্ছে। হাজার হাজার কেজো লোকের ভিড়েও ঠিক তাকে চেনা যায়। শহরপ্রবাসী যুগলের আজ প্রথম নিজেকে বড় বোকা মনে হল।

চোরকাঁটা

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে পৌঁছতে দেরিই হল অঙ্গনার। প্রায় সাড়ে বারোটা। ট্যাক্সি থেকে নেমে চোখে পড়ল সকলে এসে গেছে ইতিমধ্যে। দেবরাজ তো বটেই, বৈশাখী তন্ময় রাকা, এমনকী দিদির পিছু পিছু চিরকালের লেটলতিফ সরোজদাও। দল বেঁধে গুলতানি চলছে ফুটপাথে।

শ্যালিকাকে দেখেই সরোজদা হইহই করে উঠল, ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? তোমাদের বাড়িতে রিং হয়েই চলেছে, অথচ কেউ ফোন তুলছে না!

—ল্যাণ্ডলাইন তো কাল থেকেই ডেড। অঙ্গনা করুণ চোখে তাকাল, বাবা আজ কমপ্লেন করতে যাবে।

কঙ্কণা বোনের বেশভূষাটা দেখে নিচ্ছিল। সাদা খোলের বাংলাদেশি জামদানিখানা বুঝি তেমন পছন্দ হয়নি। ভ্রুভঙ্গি করে বলল, কী যে করিস না! আমরা সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে...!

পাশ থেকে তন্ময়ের ফোড়ন, বেচারা দেবরাজের তো চিন্তায় চিন্তায় কপালে পার্মানেন্ট ভাঁজ পড়ে গেল।

দেবরাজ যেন সত্যিই খানিক উদ্বেগে ছিল এতক্ষণ। পাতলা মেঘ সরে হাসি ফুটেছে মুখে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আরে দূর, ঘাবড়াব কেন। আসলে ওর মোবাইলটাও বন্ধ, যোগাযোগই করা যাচ্ছে না...

—যাহ, বাজে কথা। অঙ্গনা তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে বার করল সেলফোনখানা। পরক্ষণেই জিভ কাটল, ওমা, তাই তো! সকালে আজ অনই করিনি!

—খুব নার্ভাস হয়ে আছিস মনে হচ্ছে? বৈশাখী চোখ টিপল, টেনশন?

ঠিক তা নয়, তবে অঙ্গনা খানিক অস্বস্তিতে পড়েছিল বইকি! আর অস্বচ্ছন্দ

পরিস্থিতি মানেই তো এক ধরনের মানসিক চাপ। বাবাহ্ যা খেল দেখাল টুকটুক!

জ্ঞান হওয়া ইস্তক টুকটুক জানে সকাল নটার মধ্যে অফিস যায় মা। ঘটনাটা টুকটুকের কাছে এতই স্বাভাবিক, কখনও সে বায়না জোড়ে না। কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তো মা'র ওই প্রস্থান খেয়ালই করে না আজকাল। সেই মেয়ে আজ যেন গন্ধ পেয়ে গেল। নাকি সকালে ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছোটা মা আজ হেলেদুলে তৈরি হচ্ছে, অনেকটা সময় নিয়ে সাজগোজ করল...এতেই বুঝি টুকটুকের ষষ্ঠেন্দ্রিয় সংকেত পাঠাল বিব্‌বিব্! ব্যস, অমনি আবদার শুরু। কোথায় যাচ্ছ! আমিও যাব! একবার না বলতেই মেয়ের ঠোঁট ফুলে এতখানি। অঙ্গনা যতই অফিসের দোহাই দিক, দাদু-দিদা যতই ভোলাক, টুকটুক আর শুনলে তো। কত কষ্টে তাকে শান্ত করে, চকোলেট-বাবল্‌গাম ঘুষ দিয়ে, স্কুলে পাঠিয়ে তবে না স্বস্তিতে রওনা হতে পারল অঙ্গনা।

কিন্তু এই সব গল্প নিশ্চয়ই এখন শোনানো যায় না। অঙ্গনা জবাব না দিয়ে হাসল আলতো। বৈশাখীর পিঠে ছোট্ট চাপড় দিয়ে বলল, ফালতু বকে আর সময় নষ্ট করিস না তো। চল, চল।

সরকারি ছাদনাতলাটি দোতলায়। পুরনো আমলের বাড়ি, উঁচু উঁচু সিঁড়ি, মাত্র একটা তলা ভাঙতেই হাঁপ ধরে যাওয়ার জোগাড়। ওপরে এসে অঙ্গনা একটু দম নিল। অফিসঘরখানা দেখে ঈষৎ হতাশ। ঘুপচি মতন নয়, বেশ বড়সড়ই, তবে কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। একে এলাকাটাই ঘিঞ্জি, বাড়ির গায়ে বাড়ি, তার ওপর দুটো জানলাই পশ্চিমমুখো, ঘরে আলো ঢুকবে কোত্থেকে। দু'-দু'খানা টিউবলাইট জ্বলছে, তাদেরও ভারি নিষ্প্রভ দেখায়। চেয়ার-টেবিল-আসবাবেরও কী ছিরি, যেন জীর্ণতার বিজ্ঞাপন। এমন মলিন পরিবেশে জীবনের শুভ মুহূর্তের সূচনা হয়? কী দেখে এই অফিসটা পছন্দ করল দেবরাজ?

পলকের জন্য স্মৃতির মৃদু টোকা। কৌশিকের সঙ্গে বিয়েটা হয়েছিল সন্ধেবেলায়। গোটা বিয়েবাড়ি তখন আলোয় আলোয় ঝলমল। বাজছে সানাই, উলু দিচ্ছে মা-মাসিরা, শঙ্খধ্বনিতে গমগম চারিদিকে নিমন্ত্রিতদের হইহল্লায় খুশির লহর বইছে যেন। তা অমন একটা চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যের পরিণতিই বা কী হল? সাড়ে তিন বছরের মাথায় জোড় ভেঙে খানখান।

অবাঞ্ছিত ভাবনাটাকে সরিয়ে অঙ্গনা চেয়ার টেনে বসল। পাশে চোস্ত-পাঞ্জাবি শোভিত দেবরাজ। বাকিরাও আসন নিয়েছে যে যার মতো। কাগজের

মোড়ক খুলে দু'খানা মোটা মোটা জুঁইফুলের মালা টেবিলে রাখল রাকা, কঙ্কণার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বেরল সিঁদুরকৌটো, সরোজের ঝোলা থেকে এক বাক্স লাড্ডু।

টেবিলের উল্টোপারে রেজিস্ট্রার সাহেব। আইনি বিয়ের পুরুতমশাই। গোলগাল চেহারা মধ্যবয়সি মানুষটি ভাবলেশহীন মুখে কাগজপত্র ঘাঁটছেন। চালশে চশমার ফাঁক দিয়ে দেবরাজ-অঙ্গনাকে দেখে নিয়ে বললেন, কী রেডি?

তন্ময় উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, হান্ড্রেড পারসেন্ট। ওরা তো মুখিয়ে আছে। আপনি হুইসল মারলেই দৌড় স্টার্ট।

—পেপার সব আনা হয়েছে? যা যা বলেছিলাম?

—এভরিথিং হাজির স্যার। সরোজ ঝোলা দেখাল, অরিজিনাল-জেরক্স যা চাইবেন পেয়ে যাবেন।

—অ। এবার তাহলে শুভ কাজটা...

—এক সেকেন্ড। তন্ময় ঝটাক উঠে দাঁড়িয়েছে, আগে মালা দুটো পরিয়ে দিলে হত না?

—যাহ্, আগে সই-সাবুদটা হোক। রাকা খিলখিল হাসছে, তারপর তো মালা বদল।

—তখন তো এ ওকে পরাবে। এখন গলায় ঝোলানো থাক। ঝাক্কাস দেখাবে।

—কেন বোর করছ বস? দেবরাজ গা মোচড়াল, সিস্টেমেটিক্যালি চলুক না।

সরোজ মাথা দুলিয়ে বলল, উঁহু, আজ তো তোমাদের মত চলবে না। দেখতে হবে মেজরিটি কী চায়।

—অ্যাই তুমি আর খঞ্জনি বাজিও না তো। কঙ্কণা লঘু ধমক দিল, কাজটা সুষ্ঠুভাবে হতে দাও।

কাজ তো সামান্যই। প্রথমে এক জোড়া দস্তখত, তারপর সাক্ষীদের সই, শেষে রীতিমাফিক শপথবাক্য পাঠ। তবু তৃতীয় ধাপে কে যে একটু হোঁচট খেল অঙ্গনা! আমি, শ্রীসুব্রত ঘোষের কন্যা অঙ্গনা বসু আজ থেকে ঈশ্বর অনুতোষ শিকদারের পুত্র দেবরাজ শিকদারকে আমার বৈধ স্বামীরূপে গ্রহণ করলাম— এই মামুলি বাক্যটি উচ্চারণ করতে গিয়ে থমকাল হঠাৎ। ঠিক এই মুহূর্তে ফের কেন হানা দেয় কৌশিক? বসু পদবিটা কানে লাগল বলেই কি? গত এক বছরে বদলে নেওয়াই যেত, স্রেফ গড়িমসি করে হয়ে ওঠেনি। আবার কোর্টে ছোটো,

এফিডেভিট করো, কপি তুলে অফিসে জমা দাও.... অত হ্যাপা কে পোহায়! কিন্তু এমন একটা দিনে ওই দুটো মাত্র অক্ষরই যে অস্বস্তিকর ঠেকতে পারে, এ তো অঙ্গনার মাথায় ছিল না!

থাকার কথাও নয়। কোনও কোনও বিশেষ মুহূর্তে নামের পাশের লেজুড়টুকু যে আস্ত একটা মানুষের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, অতশত কি অনুমান করা সম্ভব? অতীতের এক অকিঞ্চিৎকর ছায়া যে কেন খোঁচা দেয় মনে?

বৈশাখী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠেলা মেরে বলল, অ্যাই মনে মনে আওড়ালে চলবে না। লাউড, লাউড। রেজিস্ট্রার সাহেব শুনবেন স্বকর্ণে।

—আহা, ওথ টেকিং কি যে সে ব্যাপার! আমার ছোটগিন্নিকে একটু টাইম দাও। সরোজ মশকরা জুড়েছে, কথাটা হৃদয় থেকে উৎসারিত হতে হবে তো!

সরোজের বাচনভঙ্গিতে হাসির ফোয়ারা। অঙ্গনাও ফিক করে হেসে ফেলল। একই সঙ্গে মনে পড়ল, এরকমই একটা রসিকতা কৌশিকের সঙ্গে রেজিস্ট্রির সময়েও করেছিল না সরোজদা?

চকিত আলোড়নটুকু সরিয়ে বাঁধাগতের বাক্যটি সম্পূর্ণ করল অঙ্গনা। সমবেত করতালির মধ্যে সাঙ্গ হল মালাবদল, সিঁদুর ছোঁয়ানো। সরোজ এবার সবাইকে লাড্ডু বিতরণ করছে। নিবন্ধক মশাই অবশ্য নিলেন না, রোজ রোজ রেজিস্ট্রি বিয়ের মিষ্টি খেয়ে নাকি মধুমেহতে ভুগছেন।

নীচে নেমে তন্ময় সটান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেবরাজের দিকে। জোরসে একটা করমর্দন করে বলল, কনগ্র্যাট্স বাডি।

দেবরাজ মুচকি হেসে বলল, থ্যাঙ্কস।

—জব্বর প্রমোশন পেলি কিন্তু। ছিল ফ্রেন্ড হয়ে গেলি হাজব্যান্ড।

—হুম।

—এবার আমাকেও একটু দ্যাখো। এই রাকা-মাকারা তো আমায় কোনওদিন পুঁছলই না। দিব্যি যে যার বর-বাচ্চা নিয়ে লটরপটর করছে। এদিকে আমি তো থার্টি ক্রস করে গেলাম। এরপর রিক্লেকশনের স্ট্যাম্প না পড়ে যায়!

—বাঁচা যাবে। বৈশাখী ঝেঁঝে উঠল, আমার বর তো অ্যানাউন্স করেই দিয়েছে, ধর্মের ষাঁড় হয়েই ঘোরাটাই তোর নিয়তি।

—তোরা কেউ বরকে ডিভোর্স করবি না, না রে? আমিও তাহলে দেবরাজের মতো একটা চান্স পেতাম।

নিছক রঙ্গ করেই বলা, তবে কথাটা অঙ্গনাকে বিঁধেছে সহসা। মুখের স্মিত ভাব বজায় রাখতে চেয়েও পারল না। তন্ময়ের যে চিরকালই তালজ্ঞান কম,

কোথায় কী বলতে হয় সে বোধটুকু নেই, অঙ্গনা জানে। কিন্তু তন্ময়ের ওই প্রশ্নই কি বলে দেয় না, দেবরাজ আর অঙ্গনাকে নিয়ে বন্ধুবান্ধব মহলে কানাকানি চলে নিয়মিত?

অঙ্গনা চোরা চোখে দেবরাজকে দেখল একঝলক। দেবরাজ যেন শুনেও শোনেনি, তার উদাস দৃষ্টি আকাশপানে। নেহাতই উপেক্ষাভরে কথাটাকে উড়িয়ে দিল কি? কৌশিক হলে কিন্তু কিছু একটা প্রতিক্রিয়া ঘটতই। নিদেনপক্ষে লাল হয়ে যেত মুখখানা। যা স্পর্শকাতর স্বভাব।

তুৎ, যত্তসব ফালতু ভাবনা। আজ নো কৌশিক। নেভার। এক মুহূর্তের জন্যও নয়।

নিজেকে স্থিত করার জন্য জোর করে মুখে একটা আহ্লাদী ভাব ফুটিয়ে অঙ্গ না পলকে উচ্ছল, ও সরোজদা, ট্যাক্সি-ম্যাক্সি ডাকুন। লাঞ্চ করতে হবে না?

নিজের স্বর নিজের কানেই কেন যে বেখাপ্পা ঠেকল অঙ্গনার!

ছোট্ট চিনা রেস্তোরাঁ। এতক্ষণ ফাঁকা ফাঁকা ছিল, একসঙ্গে সাত মূর্তির আগমনে নিমেষে সরগরম। দু'খানা টেবিল জুড়ে গেল পাশাপাশি, ওয়েটাররা শশব্যস্ত, মুখের কথা খসার আগেই গ্লাসে গ্লাসে জল হাজির। বসেই গল্পে মেতে উঠেছে গোটা দল। বৈশাখীই বকছে বেশি। যমজ বাচ্চা সামাল দিতে তার কেমন হিমশিম দশা, দুই বিচ্ছু কীভাবে পাল্লা দিয়ে তাকে নাকাল করে, শোনাতে গিয়ে নিজেই হেসে কুটোপাটি। রাকার একটু অফিস অফিস বাই আছে, ফাঁক পেয়ে ঝাঁপি খুলছিল, তাকে আওয়াজ মেরে থামাল তন্ময়। এরই মাঝে সরোজের টুকটাক টিপ্পনী, অমনি টেবিল জুড়ে পায়রা ওড়ানো হাসি।

দেবরাজও হাসছে, খোলা গলায়। লঘু পরিবেশটা বেশ লাগছে অঙ্গনার। বিয়ের দিন বলে কথা, খানিক হইচই না হলে মানায়। তবে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও তো করতে হয় এবার। কৌশিক হলে এসেই আগে অর্ডারটা দিয়ে দিত।

অঙ্গনা বলেই ফেলল, কী রে দেবরাজ, তোর কি হুঁশ-টুশ নেই? মেনুকার্ডটা খোল, দ্যাখ কে কী খাবে।

দেবরাজের তুরন্ত্ জবাব, আমি কেন, তুই রয়েছিস, দিদি-সরোজদা রয়েছে...

—উঁহু, আজ তুমি বলির পাঁঠা। সরোজ মাথা দোলাচ্ছে, কতটা বধ হবে নিজেই ঠিক করো।

—ধুস, আজ ব্যাটার ক'-পয়সাই বা খসবে! রাকা ফুট কাটল, মাত্র এই ক'জনকে খাইয়ে ও পার পাবে নাকি?

—জানি রে বাবা, জানি। বড়সড় না ধসিয়ে তোরা কি ছাড়বি!

—তা সেটা হচ্ছে কবে?

প্রশ্নটা অঙ্গনাকে চালান করে দিল দেবরাজ, কী রে, কবে পার্টি দিচ্ছি আমরা?

—আগে ফ্ল্যাটের কাজকর্মগুলো শেষ কর, ঠিকঠাক গুছিয়ে নিই...

—অ্যাই, তোরা এখনও তুইতোকারি করছিস কেন রে? কঙ্কণার গলায় দিদিসুলভ ধমক, বিয়ে তো হয়ে গেছে, এবার তুমিতে ওঠ।

—অভ্যেস কি একদিনে পাল্টায় দিদি? দেবরাজ মুচকি মুচকি হাসছে, আমি যে একজন বিবাহিত মানুষে পরিণত হয়েছি, এইটাই তো এখনও মাথায় ঢোকেনি।

—কবে ঢুকবে?

—থোড়া ওয়াক্ত লাগেগা।

অঙ্গনার হাসি পেয়ে গেল। সত্যিই তো, দেবরাজকে এখনও একটুও বর বর মনে হচ্ছে না। কৌশিককে কিন্তু বিয়ের দিনই যথেষ্ট স্বামী-স্বামী লাগছিল। যা গ্রাম্ভারি মুখে বরাসনে বসেছিল।

ওফ্, আবার সেই কৌশিক। সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে অঙ্গনা নিজেই খাদ্যতালিকাটা টানল। আলগা চোখ বুলিয়ে ডাকল স্টুয়ার্ডকে। প্রথমে মুখ চালানোর মতো কিছু তো আসুক। তারপর ধীরেসুস্থে নয় মেন কোর্স। চোখ নাচিয়ে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করল, তোরা আর কিছু নিবি? স্যুপ-টুপ?

—ওরে বাবা, স্যুপ খেলেই আমার পেট ভরে যায়।

—বাদ। বাদ। ভেজাল বিলকুল বাদ।

—শেষে বরং ডেজার্ট চলতে পারে।

নির্দেশ টুকে নিয়ে চলে গেল টাইবাঁধা লোকটি। ভিনিগারে ভেজানো মিষ্টি মিষ্টি পেঁয়াজের টুকরো কচকচ চিবোচ্ছে তন্ময়। মেজাজি ভঙ্গিতে দেবরাজকে বলল, তারপর? তোরা হানিমুনে কবে যাচ্ছিস?

—না গেলেই নয়? কলকাতাতেই তো খাসা আছি। একদিন নয় লঞ্চে বেলুড় ঘুরে আসব।

—ফাজলামি রাখ। মধুচন্দ্রিমা ছাড়া বিয়ে কমপ্লিট হয় না।

—বলছিস? তাহলে তো ছুটিছাটা নিতে হয়। প্ল্যান-ট্যান কিছু করতে হয়।

—প্ল্যান প্রোগ্রামের কী আছে! টিকিট কাটবি, নর্থ বেঙ্গল চলে যাবি। তারপর সোজা হিমালয়। গ্যাংটক, পেলিং...

—আমি পাহাড়ে যাব না।

বলে ফেলেই অঙ্গনা থতমত। আশ্চর্য, না কেন বলল? পাহাড় তো সে ভালইবাসে। ধ্যানগম্ভীর বরফচূড়া, সবুজের বাহার, পাগলা ঝোরা, সঙ্গে একটা শীতল আমেজ, তাকে যথেষ্টই টানে। কৌশিকের সঙ্গে মধুযামিনী যাপন করতে সিকিম গিয়েছিল, সেই স্মৃতিই কি নিষেধবার্তা পাঠাল হঠাৎ?

দেবরাজের চোখে চোখ রেখে অঙ্গনা বলল, আমরা বরং ভাইজাগ যেতে পারি। ওদিকটা কখনও ঘোরাই হয়নি।

—নট আ ব্যাড আইডিয়া। আরাকু ভ্যালিও দেখে আসা যাবে।

অঙ্গনা স্বস্তি বোধ করল। যাক্, তার খচখচানিটা বোধহয় টের পায়নি দেবরাজ। তবে ওয়ালটেয়ার হোক, আর যেখানেই হোক, যাওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট। টুকটুকের কী হবে? দাদু-দিদার কাছে রেখে যাবে? তাকে ফেলে বেড়াতে গেলে মেয়ের অভিমান হবে না? আবার সঙ্গে নিয়ে গেলেও সমস্যা। ভ্রমণটা আদৌ মধুচন্দ্রিমা থাকবে কি? অন্তত দেবরাজের কাছে? এই সব সাতপাঁচ ভেবেই প্রসঙ্গটা পাড়েনি অঙ্গনা। দেবরাজও এড়িয়ে গেছে সযত্নে।

প্রথম দফার খাবার টেবিলে হাজির। মুচমুচে পালংশাক ভাজা, চিংড়ির বড়া, দু'-তিন রকমের ডিমসাম। প্লেটে প্লেটে পরিবেশনও হয়ে গেল। উঠেও যাচ্ছে টুপটাপ।

কঙ্কণা টয়লেটে গিয়েছিল। ফিরে বোনের পাশে বসে গলা নামিয়ে বলল, বাবাকে এবার একটা মোবাইল কিনে দিতেই হবে, বুঝলি।

চট করে ব্যাপারটা বোধগম্য হল না অঙ্গনার। অস্ফুটে বলল, কেন?

—এই তো... বাড়িতে ফোন করলাম... ভাবলাম, সব ঠিকঠাক চুকে গেছে খবরটা দিয়ে দিই। তা এখনও লাইন বেহাল, বেজেই গেল।

—আজ ঠিক হওয়ার চান্স নেই।

—কিন্তু একটা ইন্টিমেশন তো দেওয়া দরকার। তুই তো আবার রাতে ফিরছিস না।

—সেরকমই তো কথা হয়েছে। মা-বাবা জানে।

—তবু... মা যা টেনশন পার্টি, চিন্তা তো করবেই। কঙ্কণা পলক ভেবে নিয়ে বলল, নো প্রবলেম। ফেরার পথে আমরাই নয় বুড়ি ছুঁয়ে যাব।

—টুকটুকের সামনে কিন্তু কিছু বলিস না।

—না রে বাবা না, ওটুকু আক্কেল আমার আছে। কিন্তু...

—কী কিন্তু?

—তোরা যে এর পর আলাদা থাকবি... তুই টুকটুক আর দেবরাজ... হিন্ট দিয়েছিস মেয়েকে?

—না রে। এবার দেখি...। একটু রইয়ে-সইয়ে...। এখনই তো শিফ্‌ট করছি না।

—বাবা-মা'র কিন্তু টুকটুককে ছেড়ে দিত খুব কষ্ট হবে।

খুট্ করে কথাটা কানে বাজল অঙ্গনার। ছেড়ে দিত মানে? টুকটুক কি বাবা-মা'র? তবে অঙ্গনা তো এও অস্বীকার করতে পারে না, ওই নাতনি এখন দাদু-দিদার প্রাণভোমরা। এবং সেটাই স্বাভাবিক। অঙ্গনা যখন কৌশিকের বাড়ি থেকে পাকাপাকি চলে এল, টুকটুক কতটুকু। দুইও হয়নি। তখন থেকেই তো নাতনির সঙ্গে লেপটে আছে দাদু-দিদা। অঙ্গনা তো দেখেছে, আপসে ছাড়াছাড়ির চুক্তিপত্র তৈরির আগে দু'জনেই কী পরিমাণ উদ্বেগে ছিল। যদি কৌশিক মেয়েকে না ছাড়তে চায়? যদি মামলা জোড়ে? সংশয় অবশ্য অঙ্গনারও ছিল। কৌশিক যা ইগোয়িস্ট। সুখের কথা, শেষ পর্যন্ত কোনও ঝামেলা পাকায়নি। বদলি হয়ে তখন চলে গেছে নয়ডায়। হিসেবে তো কৌশিক যথেষ্ট দড়, বুঝেছে বোধহয় একা একা মেয়ের ঝক্কি সামলানো মুখের কথা নয়। আর তারপর তো টুকটুককে পুরোপুরি কব্জায় পেয়ে দাদু-দিদার জীবনটাই নাতনিময় হয়ে গেল। এই যে এখন বাবা-মা অঙ্গনার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে তেমন প্রীত নয়, তার একটা কারণ তো নাতনিই।

কী আর করা, যা অবশ্যম্ভাবী তাকে তো মানতেই হবে। অঙ্গনা নিশ্চয়ই টুকটুককে ফেলে দেবরাজের ঘর করতে যাবে না। প্রশ্নই ওঠে না। তবে একটা সমাধান ছকাই আছে। অফিস যাওয়ার পথে মেয়েকে দাদু-দিদার হাতে জিম্মা করে দেবে, ফেরার সময়ে ট্যাঁকে নিয়ে ব্যাক। বছরখানেক চলুক তো এরকম। এরপর তো টুকটুক বড় স্কুলে ভর্তি হবে। ততদিনে নিশ্চয়ই দেবরাজের সঙ্গে আরও নৈকট্য গড়ে উঠবে মেয়ের। আশা করতে দোষ কী! দেবরাজ খুবই ভালবাসে টুকটুককে। রগুড়ে ছেলে, টুকটুকের সঙ্গে তার পটেও ভাল।

তবু কেন যে একটা খচখচানি থেকেই যায়। চাপা আশঙ্কাও। কৌশিক তো মাঝে মাঝে কলকাতায় আসবেই, তখন যদি কিছু গোল পাকিয়ে দেয়...।

ভাবনার মাঝেই খাবারের দ্বিতীয় প্রস্থ উপস্থিত। একের পর এক ধোঁয়া ওঠা পাত্র নামছে টেবিলে। সকলেরই পেট খিদেয় চনচন, ঝটাপট মন দিচ্ছে

আহারে। কাঁটা-চামচের টুংটাং ধ্বনি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই এখন।

ভূরিভোজ চুকতে চুকতে প্রায় আড়াইটে। কব্জিঘড়িতে সময় দেখেই বৈশাখী লাফ দিয়ে উঠেছে, সর্বনাশ হয়ে গেল! সর্বনাশ হয়ে গেল।

—কেন রে? কী হল?

—তিনটেয় পিং-পংদের স্কুল ছুটি। তখন যদি আমায় গেটে না দেখে, দু'জনে এমন চিলচিৎকার জুড়বে...। হ্যাঁ রে, পৌঁছতে পারব তো?

—খুব পারবি। দৌড়ে যা, চর্বি খানিকটা ঝরবে।

হাস্যরোলের মাঝেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বৈশাখীর ছুট। মৌরি চিবোতে চিবোতে বাকিরাও রেস্তোরাঁর বাইরে। ছোট একটা ঢেকুর তুলে সরোজ বলল, এবার আমরাও তাহলে কাটি?

কঙ্কণা বলল, হ্যাঁ ট্যাক্সি ধরো। ভবানীপুরে একবার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে...

—ওদিকে যাবেন? রাকা চোখ ঘোরাল, তাহলে তো আমিও আপনাদের ট্যাক্সিতে যেতে পারি।

তন্ময় কাঠিতে দাঁত খোচাচ্ছিল। তেরচা চোখে দেবরাজকে জিজ্ঞেস করল, তোরা কি এখন স্ট্রেট তোদের নতুন ফ্ল্যাটে?

—কেন বল তো?

—আমার তো এখন কিছুই করার নেই। চল, তোদের খানিক কম্প্যানি দিই গিয়ে।

—খবরদার না। রাকা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।

—কোথায়?

—গড়িয়াহাট মোড়ে ছেড়ে দেব। চারদিকে চারটে রাস্তা, যেদিকে খুশি হাঁটবি। বলেই অঙ্গনাকে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিল রাকা। চোখ টিপে বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

তন্ময়কে প্রায় বগলদাবা করে রওনা দিল সবাই। সদ্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। অঙ্গনা ঈষৎ আনমনা। আশ্চর্য, সবেমাত্র বিয়ে হল, অথচ তেমন কোনও অনুভূতি জাগছে না কেন? নতুন ধরনের কিছু? দেবরাজের কিছুই তার অজানা অচেনা নয়, এটাই কি বিয়ের রোমাঞ্চকে ফিকে করে দিল? আলাদা কোনও পুলকও তো নেই! কিংবা রহস্য! দ্বিতীয় বিয়ে কি এরকমই হয়?

দেবরাজ মৃদু ঠেলা দিল, কী রে, কী ধ্যান করছিস?

অঙ্গনা নড়ে উঠল, কিছু না তো!

দেবরাজের ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, তোকে কিন্তু বেশ বউ-বউ লাগছে। পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদূর...

আহা, সিঁদুর পরে আমায় আগে যেন দেখিসনি। কথাটা বলতে গিয়েও অঙ্গনা থমকেছে। ছিঃ, ওই সংলাপ কি এখন শোভা পায়!

অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। তেতলার পুঁচকে ব্যালকনি থেকে সামনের লেকটা দেখছিল অঙ্গনা। নামেই লেক, আদতে বড়সড় পুকুর। তবে পাড়-টাড় বাঁধিয়ে চেহারাখানা বেশ জমকালো। আলো পড়ে জল চিকমিক। চমৎকার একটা হাওয়াও বইছে। ফাল্গুনের নরম বাতাস। শরীর জুড়িয়ে যায় যেন।

নাহ্, ফ্ল্যাটটা দেবরাজ মন্দ বাছেনি। যদিও চূড়ান্ত পছন্দটা অঙ্গনারই। ঘরদোর কেনার সময়ে অনেক দেখেবুঝে নিতে হয়, ছেলেদের মাথায় অতশত আসে না। ওই লেকটির কল্যাণে পূব-দক্ষিণ খোলাই থাকবে বরাবর। শুধু জায়গাটা শহরের একটু প্রান্তে, এই যা। তাতে কোনও অসুবিধে নেই, বাস-মিনিবাস, বাজারহাট, সবই প্রায় দরজায়। ভবানীপুরেও যাওয়া যাবে সরাসরি। তবে হ্যাঁ, ফ্ল্যাটটা আর একটু বড় হলে ভাল হত, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যেত দিব্যি। এখানে ঘরগুলো ভবানীপুরের বাড়ির চেয়ে অনেক ছোট। আর কৌশিকদের তুলনায় তো...

ফের কৌশিক কেন? অঙ্গনা কষে ধমকাল নিজেকে। বাড়িখানাই বড় ছিল কৌশিকের, মনটা তো ছোট্ট, এইটুকুন। একটা বিশ্রী রকমের কেজো লোক, রস-কষ বস্তুটিই ধাতে নেই, সম্পূর্ণ এক ছকে বাঁধা জীব। আজ যে সারাটা বিকেল তারা দু'জনে টো টো করে বেড়ালো, এলোমেলো হাঁটল এরাস্তা-ওরাস্তায়, আপন খেয়ালে কত কী বকবক করছিল দেবরাজ—স্বপ্নেও বোধহয় কৌশিক এ হেন সময়ের অপচয় ভাবতে পারে না। এত তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে তুলকালাম করত কৌশিক। চাবি আলমারিতে ঝুলছে কেন! ইস্ত্রি করা জামাকাপড় কেন গুনে রিসিভ করনি! আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন নিউজপেপারের লোকটাকে পে করলে! কৌশিককে জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরে অঙ্গনা তো বেঁচে গেছে। এবার একেবারে ছেঁটে ফেলতে হবে মন থেকে। ফেলতেই হবে।

দরজায় শব্দ। অঙ্গনা ব্যালকনি থেকে ফিরল। হ্যাঁ, দেবরাজ চাবি খুলে ঢুকছে। এক হাতে প্লাস্টিকের বড়সড় ঝোলা, অন্য হাতে রজনীগন্ধার গোছা। অঙ্গনা পুলকিত মুখে বলল, হঠাৎ ফুল আনতে গেলি কেন?

—পুষ্প বিনা কি ফুলশয্যা হয় সখি!

—খ্যাপা না খ্যাপা! অঙ্গনা হেসে ফেলল, সাজাবি কোথায়?

—বিছানায় ছড়িয়ে দেব।

—পারিসও বটে।

কোমল ভ্রুকুটি হেনে ফুলটা নিল অঙ্গনা। রজনীগন্ধার ঘ্রাণ নিতে নিতে এসেছে পুবের ঘরে। এটাই ফ্ল্যাটের একমাত্র বাসযোগ্য কক্ষ এখন। সদ্য কেনা খাট, আলমারি, মিনি ওয়ার্ড্রোব ছাড়াও রয়েছে একখানা টেবিল, সঙ্গে খানদু'য়েক চেয়ার। দেবরাজ মাঝে মাঝে এসে থাকছে এখানে, তারই মোটামুটি একটা বন্দোবস্ত।

হাতের ঝোলা টেবিলে রেখে বিছানায় বসেছে দেবরাজ। আড়মোড়া ভেঙে বলল, আজকের মতো আমার জব ফিনিশ্‌ড। রুটি-তরকা, জলের বোতল, কাগজের প্লেট-গ্লাস, সব এনে দিয়েছি। আর আমি কিচ্ছুটি করব না।

—হুঁহ, কী আমার কাজের মানুষ রে! ফুলের গোছা বিছানায় নামিয়ে দেবরাজের চুল আলগা ঘেঁটে দিল অঙ্গনা। ধপাস্ করে পাশে বসে বলল, তুই একটা আস্ত ঢ্যাঁড়োশ।

—কিঁউ?

—এই কটা দিন কী করলি শুনি? গত সপ্তাহে ফ্ল্যাটের যে-হাল দেখে গিয়েছিলাম, এখনও তো সেই অবস্থা। রংটা অন্তত কমপ্লিট হওয়া উচিত ছিল।

—মিস্ত্রিগুলো মাঝে দু'দিন ডুব দিল যে। ওদের কী একটা পরব গেল...

—এই করে করেই ডেট পিছোচ্ছে। কত বার বলেছি ওই কন্ট্রাক্টর লোকটার ভরসায় থাকিস না, নিজে ওয়াচ রাখ।

—রাখছি তো। এই তো, এবার টানা কয়েক দিন ছুটি নেব।

—তোর সবই বড্ড গয়ংগচ্ছ। আমি কিন্তু বাথরুম-কিচেনের ফিটিংসের সময়ে রেগুলার এসে সার্ভিস দিয়ে গেছি। উঠেপড়ে না লাগলে ওগুলোও যেমনকার তেমন পড়ে থাকত।

—কী করা যাবে বল, আমি তো তোর মতো উদ্যোগী নই। কৌশিক বসুর ট্রেনিংয়ে তো আমি থাকিনি।

—অ্যাই, একটা ফালতু লোককে টানছিস কেন রে? দেবরাজের পরিহাসে অঙ্গনার আঁখিতে ছদ্ম কোপ, আমরা কী প্রমিস করেছি ভুলে গেলি? নো অতীত ঘাঁটাঘাঁটি।

—সরি, সরি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। অঙ্গনার কাঁধে হাত রাখল

দেবরাজ। নতুন বউয়ের গাল টিপে দিয়ে বলল, জানিসই তো আমি ঢিলেঢোলা আদমি। তাড়া লাগাস কেন? বাড়ির কাজ দশ দিনে শেষ না হলে বিশ দিনে হবে। ক'টা দিন দেরিতেই নয় লাইফ স্টার্ট।

—বুঝেছি। আমরা একসঙ্গে রইলাম কি না রইলাম, তাতে তোর কিছু আসে যায় না।

—যাহ্ বাবা, কী কথার কী অর্থ! আর একটু ঝুঁকে অঙ্গনার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল দেবরাজ। গাঢ় স্বরে বলল, তুই বুঝিস না, আমি তোকে কতটা চাই!

অঙ্গনার শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ। চেনাও বটে, অচেনাও বটে। যখনই শব্দ ক'টা উচ্চারণ করে দেবরাজ, প্রতিবারই যেন নতুন লাগে। আরও গভীর, আরও উত্তেজক। আর একজনও বলত প্রথম প্রথম। কিন্তু তাতে কণামাত্র মাদকতা ছিল না। সাদামাটা গদ্যও কখন যে কবিতা হয়ে যায়!

দু'হাতে দেবরাজের গলা বেড় দিয়ে ধরল অঙ্গনা। টানল মাথাটা, ঠোঁট চেপে ধরেছে ঠোঁটে। দীর্ঘ চুম্বন যেন শেষ হতেই চায় না। যেন এখনই সে শুষে নেবে দেবরাজকে।

কতক্ষণ কাটল কে জানে। হয়তো কয়েক মিনিট। হয়তো বা অনন্তকাল। এক সময়ে নিজেকে বিযুক্ত করে অঙ্গনা উঠে দাঁড়াল। শাড়িটা চটকে-মটকে গেছে, কাল এটা পরেই অফিস যেতে হবে, আর দলামোচড়া করা উচিত নয়। টুকটুককে লুকিয়ে একটা নাইটি পুরেছিল ব্যাগে, টয়লেটে গিয়ে নিজেকে বদলে এল রাতপোশাকে। শাড়িখানা ভাঁজ করছে সযত্নে। হঠাৎই দেবরাজকে বলল, একটা ব্যাপার কিন্তু মাথায় রাখিস। আমি নয় ক'দিন পরেই এলাম, তবে পার্টির হাঙ্গামাটা আগে চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

দেবরাজ বিছানায় আধশোওয়া। পা দোলাতে দোলাতে বলল, ম্যাডামের হুকুম শিরোধার্য। কবে আয়োজনটা করি?

—নেক্সট উইক-এন্ডে হতে পারে। ওটাকে নয় আমাদের ফরমাল গৃহপ্রবেশ বলেও চালিয়ে দেব।

—বেড়ে আইডিয়া তো! এক ঢিলে দুই পাখি!

—কমন সেন্সটাকে একটু খাটাতে হয় বুঝলি।... তা মোটামুটি কতজন নিমন্ত্রিত হতে পারে?

—কত আর! দেবরাজ কপাল কুঁচকে উঠে বসল, এই ধর আমাদের কমন ফ্রেন্ড সার্কেল, তোর অফিস, আমার অফিস, আর কিছু রিলেটিভ। তোদের ফ্যামিলির জনা পনেরো, আর আমার বাড়ির যে-যে এল।

—যে-যে মানে? সবাই আসবে না?

—দাদা-বউদি হয়তো অ্যাটেন্ড করবে...। দেবরাজ একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি কাউকে সাধাসাধি করতে যাব না।

দেবরাজের গোটা পরিবারটাই এ বিয়েতে গররাজি, অঙ্গনা জানে। বিশেষত দেবরাজের মা। একে ডিভোর্সি, তায় বাচ্চা রয়েছে, এমন মেয়েকে ক'টা বাড়িই বা সহজে বউ হিসেবে মানতে পারে।

তবু ভাবলে কোথায় যেন একটা চিনচিন করে। মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়।

কিঞ্চিৎ ভার গলায় অঙ্গনা বলল, আমি কি একবার তোর মা'র কাছে যাব?

—এখন নয়, পরে। বলেই হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল দেবরাজ। ঝুপ করে খাট থেকে নেমে চেয়ারে গিয়ে বসেছে। ঝোলা থেকে তরকার ভাঁড় বার করে বলল, আয় আয়, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে খেয়ে নিই।

দেবরাজ যে প্রসঙ্গ ঘোরাল, দিব্যি টের পেল অঙ্গনা। কথা না বাড়িয়ে এসেছে টেবিলে। কাগজের থালায় ভাগ করল খাবার। দুপুরের খাওয়া এখনও হজম হয়নি, অত হাঁটাহাঁটির পরও। নিজের প্লেটে একখানা মাত্র রুটি নিয়ে অঙ্গনা আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, টুকটুকের ফার্নিচারগুলো কবে দিচ্ছে?

কাঁচা পেঁয়াজে কামড় বসিয়ে দেবরাজ বলল, রোববারই তো ডেলিভারির ডেট। দেরি হলে বড় জোর মানডে।

—বানাচ্ছে ঠিকঠাক? যেমনটা বলেছি?

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ, এভরি অল্টারনেট ডে একবার করে সরেজমিনে যাই। দেবরাজ গলা ঝাড়ল, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, জানিস। রিগার্ডিং টুকটুক।

—কী?

—এই যে রোজ ওকে ভবানীপুরে রেখে যাবি, আবার টানতে টানতে আনবি, মেয়েটার কিন্তু খুব স্ট্রেন পড়বে।

—উপায় কী?

—যদি একটা পুলকার অ্যারেঞ্জ করা যায়...এখান থেকে ডাইরেক্ট স্কুলে পৌঁছে দিল... তারপর ছুটি হলে মেসোমশাই গিয়ে...

—মেসোমশাই নয়, বাবা। রিলেশনটা আজ থেকে বদলে গেছে।

—তাই তো! খেয়ালই থাকছে না। দেবরাজ হেসে ফেলল, হ্যাঁ, যা

বলছিলাম... বাবা নয় স্কুল থেকে কালেক্ট করলেন, আর তুই নয় ফেরার পথে মেয়েটাকে তুলে আনলি।

—পুলকার অদ্দুর যাবে নাকি?

—শুনলাম তো রাসবিহারী অবধি যায়ই। ওদেরই কারওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে-টলে... যা এক্সট্রা লাগবে দিয়ে দেব।

প্রস্তাবটা তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হল না অঙ্গনার। ব্যবস্থা যদি করা যায়ও, অঙ্গনার ভার হয়তো সামান্য লাঘব হবে, কিন্তু টুকটুকের চাপ আদৌ কমবে কি? তবু দেবরাজ যে টুকটুককে নিয়ে ভাবিত, এটা শুনতে ভাল লাগল।

খাওয়া সেরে অঙ্গনা ফের একবার ব্যালকনিতে গেল। হঠাৎ টুকটুকের জন্য মন কেমন করছে। মেয়েটা কখনও রাতে মাকে ছাড়া থাকেনি, আজ কী করছে কে জানে! ক'দিন পরে তো আবার উল্টো সমস্যা। দাদু-দিদাকে ছেড়ে এখানে এসে মানিয়ে নিতে পারবে তো? মেয়েটার কাছে বাবার স্মৃতি হয়তো আবছা এখন। তবু তার জায়গায় দেবরাজকে...? টুকটুক যদি বেগড়বাই করে, দেবরাজ খুব দুঃখ পাবে। তবে বুদ্ধিমান ছেলে তো, মুখে কিছু প্রকাশ করবে না, মনেই পুষে রাখবে কষ্টটা। মাঝখান থেকে অঙ্গনাও একটা বিশ্রি টানাপোড়েনে...

—কী রে, কী ভাবছিস? কাঁধে হঠাৎ দেবরাজের হাত।

—কিছুই না। অঙ্গনা নিজেকে সমে ফেরাল। নরম হেসে বলল, এখানে হাওয়াটা ভারি সুন্দর।

—এক একদিন তো উড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি তো অনেক রাত অবধি এখানে বসে থাকি। বলেই দেবরাজ অঙ্গনার কানের পাশে মুখ এনেছে। তপ্ত নিশ্বাস ছুঁইয়ে বলল, আজ অবশ্য বসে থাকার দিন নয়।

অঙ্গনা অস্ফুটে বলল, হুঁ।

—আয়। তবে শুয়ে পড়ি।

দেবরাজ প্রায় জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে এল অঙ্গনাকে। ঢুকেই অঙ্গনার চোখ বড় বড়। ডাঁটিসুদ্ধু রজনীগন্ধা গোটা বিছানায় ছড়িয়ে দিয়েছে দেবরাজ।

ঠাট্টার সুরে অঙ্গনা বলল, এ তো ফুলশয্যার হদ্দমুদ্দ করে দিয়েছিস রে! শোবো কোথায়?

—কেন, ফুলের ওপরে। অসুবিধে হবে নাকি? গায়ে ফুটবে? দেবরাজ চোখ কুঁচকে স্বরচিত পুষ্পশয্যা নিরীক্ষণ করছে, বলিস তো সরিয়ে দিতে পারি।

সেই সকাল থেকে আজ কত কিছুই তো ফুটছে। কাঁটার মতো।

অঙ্গনার একটা ছোটো শ্বাস পড়ল। মাথা নেড়ে বলল, না, থাক।

অহং

আজ একটু আয়েস করার ইচ্ছে ছিল নয়নিকার। অনেকদিন পর বিকেল-সন্ধেটা ফাঁকা পেয়েছে। সেই পুজোর সময় থেকেই তো একটার পর একটা অনুষ্ঠান, শীত না ফুরোনো পর্যন্ত নয়নিকার রেহাই নেই। এই কলামন্দিরে একক গানের আসর, তো কাল ছোটো শিলিগুড়ি, পরশু হয়তো আসানসোল। এছাড়া গানের রেকর্ডিং আছে, টিভি চ্যানেলগুলোর ডাক আছে...। রিয়ালিটি শো'র বিচারক সাজলে তো কথাই নেই, শুটিং করতে করতে জান জেরবার। এর মধ্যেই মিউজিক-হ্যান্ডদের নিয়ে রিহার্সাল, নিজের রেওয়াজ, বেছে বেছে কয়েকটা ছাত্রছাত্রীকে গান শেখানো...। এতশত কাজে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ খানিকটা সময় আলাদা করে পাওয়া যে কী দুর্লভ এখন!

কত কিছু করার প্ল্যান ছিল আজ। বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে গল্পের বই পড়বে, ঘরের আলো নিবিয়ে শুনবে বড়ে গুলাম আলি, কিংবা চেনাজানাদের সঙ্গে ফোনে এন্তার পি-এন-পি-সি। ফুরফুরে মেজাজে সৌমাল্যর জন্যে একটা স্পেশাল ডিশ রাঁধাই বা মন্দ কী। মাটন টিকিয়া, কি শাহী পনির, কিংবা চিকেন রোস্ট। ফ্রিজে উপকরণেরও অভাব নেই, হাতে হাতে সাহায্য করতে কাজের লোকও মজুত, অতএব সৌমাল্যকে আজ একটা চমক দেওয়াই যেত।

সময়টা সেই মতোই এগোচ্ছিল। গোটা বিকেল ধরে পুজোসংখ্যার একটা উপন্যাস শেষ করল নয়নিকা। তারপর সন্ধে নাগাদ আড়মোড়া ভেঙে সবে কর্ডলেস ফোন হাতে নিয়েছে, দরজায় মূর্তিমতী বিঘ্ন। শিবুর মা।

—দিদি, আপনার কাছে একজন এসেছে।

—কে?

—একটা মেয়েলোক।

—আমি চিনি?

—তাই তো বলছে। আমি কিন্তু আগে দেখিনি।

নয়নিকা সামান্য ধন্দে পড়ল। ঘনিষ্ঠ কেউ নয়, বোঝাই যাচ্ছে। তারা কেউ হলে একটা ফোন করে আসত। অনেক উটকো-পুটকো মহিলা অবশ্য চেনা-জানা পরিচয়ে হাজির হয় মাঝে-সাঝে। দু-চার মিনিট স্তুতি গেয়েই বায়না জোড়ে, ফাংশানে গাইবার সুযোগ করে দিন, কিংবা কীভাবে একখানা সিডি বার করা যায় তার গুপ্ত রহস্য বলুন...। তেমন কেউ হলে তো গেল খানিকটা সময়। দেখা না করে ভাগিয়ে দেবে? দেওয়াই যায়। চাইলেই নয়নিকা দত্তর দর্শন মিলবে, এমন ধারণা থাকাটা বোধহয় ঠিক নয়। সৌমাল্য তো বলে, যার-তার সামনে বার হয়ে নিজের ভাবমূর্তিটাকে খেলো করো কেন! ভুল বলে কি?

অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েও নয়নিকা পরমুহূর্তে মত বদলেছে। শিবুর মাকে জিগ্যেস করল,—বসিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—বলো গিয়ে আমি আসছি।

বেজার মুখে নাইটির ওপর হাউসকোটটা চাপাল নয়নিকা। ঘর ছাড়তে গিয়েও কী ভেবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। আঁচড়াল চুলের সামনেটা, কাঁধ-ছোঁওয়া স্টেপকাট চুল একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিল। তারপর কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমেছে ড্রয়িং-হলে।

জড়েসড়োভাবে বসে আছে মহিলা। লম্বা সোফাটার এক কোণে। হারজিরজিরে চেহারা। খসকুটে রং, ভাঙা গাল, গর্তে ঢোকা চোখ। পরনের শাড়িটিও তথৈবচ। নেতিয়ে লেপটে আছে গায়ে। কে রে বাবা?

নয়নিকাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে মহিলা। শুকনো ঠোঁটে অদ্ভুত এক হাসি ফুটিয়ে বলল,—চিনতে পারছিস?

সরাসরি তুই! নয়নিকা দু-চার সেকেন্ড চিত্রার্পিত। মেমরি ব্যাংক হাতড়াচ্ছে। আচমকাই অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল, —সুপ্রিয়া...?

—যাক, ফাঁড়াটা কাটল। ভেবেছিলাম তুই হয়তো আমাকে...

নয়নিকার ঘোর কাটছিল না। একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে। স্কুলের সেই ঝকঝকে সুপ্রিয়া.....! সময় মানুষকে এভাবে পাল্টাতে পারে নাকি? নয়নিকার বয়সী, মানে সবে পঁয়তাল্লিশ, অথচ দেখে মনে হয় সাত বুড়ির এক বুড়ি!

উল্টোদিকের সোফায় ধপ্ করে বসে পড়ল নয়নিকা। চোখ বড় বড় করে

বলল, এ কী হাল করেছিস, অ্যাঁ?

আর বলিস না, সুগার-টুগার হয়ে....। সুপ্রিয়াও বসেছে। হাসিটাকে চওড়া করে বলল, —কবে থেকে আসব আসব ভাবছি। ফুরসতও মেলে না, সাহসও পাই না। তার ওপর তোদের সল্টলেকের এদিকটা তো ভালো চিনিও না। তবু আজ কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম। যেমন করে হোক, তোর বাড়ি খুঁজে বার করবই। তোর সঙ্গে দেখা আজ করবই।

সুপ্রিয়ার স্বরে আগের মতোই একটা আহ্লাদী আহ্লাদী ভাব। মাথাটাও দুলছে। যেমন দুলত। শুধু গাল ফোলা মুখটাই যা বদলে গেছে। বেমালুম।

নয়নিকা অল্প হেসে বলল, —তা আমার ঠিকানা পেলি কোথ্থেকে?

—তোর ঠিকানা জোগাড় করা কঠিন নাকি? এত বিখ্যাত মানুষ তুই...! তবে সঠিক বাড়িটা খুঁজে পেতে সামান্য সমস্যা হয়েছে। দুটো স্টপেজ আগে নেমে পড়েছিলাম তো। অবশ্য লোকজনকে জিগ্যেস করতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দিল।

—হ্যাঁ, দু-চারজন চেনে আর কি। নয়নিকার স্বরে একটা আত্মপ্রসাদ এসেই গেল। তাড়াতাড়ি গলা সহজ করে বলল, —যাক গে, তুই এখন আছিস কোথায়?

—খুব দূরে নয়। পাতিপুকুর।

পলকের জন্য নয়নিকার চোখ সুপ্রিয়ার সিঁথিতে। সিঁদুর আছে কি? বোঝা যাচ্ছে না। তবে আজকাল তো অনেকেই সিঁদুর ত্যাগ করেছে। নয়নিকা নিজেও তো কদাচিৎ রঞ্জিত করে সিঁথি। তবু সন্তর্পণে জিগ্যেস করল,—পাতিপুকুরে তোর শ্বশুরবাড়ি?

—ওই....বলতে পারিস। শ্বশুরমশাই একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে গিয়েছিলেন, সেখানেই আছি কোনও মতে।

সে অবশ্য পোশাক-আশাকেই মালুম হচ্ছে। তবু নয়নিকা জিগ্যেস করে ফেলল,—কোনও মতে কেন?

—ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হয়ে গেছে তো। আমাদের পড়েছে একখানা ঘর। না না, দেড়খানা। ওখানেই আছি মায়ে-পোয়ে।

—তোর বর?

আঙুল তুলে ঊর্ধ্বপানে তাকাল সুপ্রিয়া। নীচের ঠোঁটটা উল্টে বলল,—জ্বর হয়েছিল, সঙ্গে পেটে ব্যথা, বমি...হাসপাতালে দেওয়া হল, কিন্তু অসুখটা ধরা পড়ার আগেই ফৌত।

—কদ্দিন হল?

—তা ধর, পাঁচ বছর। সুপ্রিয়ার মুখে ফ্যাকাশে হাসি,—তোর বর তো খুব বড় ডাক্তার, না রে?

—হুঁ, এন্ডোক্রিনোলজিস্ট।

অর্থটা বোধহয় সুপ্রিয়া বুঝল না। আফশোসের সুরে বলল,—ইশ, তখন যদি বুদ্ধি করে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতাম! হয়তো তোর বর একটা কিছু করতে পারতেন।

নয়নিকার বুকটা, কে জানে কেন, শিরশির করছিল। সুপ্রিয়াকে কতকাল পর দেখছে সে। অন্তত আঠাশ বছর। স্কুল ছাড়ার পর যে যার মতো ছিটকে গিয়েছিল দূরে দূরে। লেখাপড়াতেও খুব একটা আহামরি ছিল না সুপ্রিয়া। কোন কলেজে ভর্তি হয়েছিল তাও নয়নিকা জানে না। কস্মিনকালে সুপ্রিয়ার কথা মনেও পড়েনি। তবু এই মুহূর্তে সুপ্রিয়ার জন্য বড় মায়া জাগছে তার। আহারে, বেচারার বরটা মরে গেল!

সহৃদয় সুরে নয়নিকা জিগ্যেস করল,—কী করতেন তোর হাজব্যান্ড?

—ছোটখাটো চাকরি। প্রাইভেট কোম্পানিতে। সুপ্রিয়া ফোঁস্ করে একটা শ্বাস ফেলল,— সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে বাবা মারা গেল তো, মা আর টানতে পারল না। হাতে যেমন তেমন একটা সম্বন্ধ আসতেই আমায় ঝুলিয়ে দিল। আমিও আপত্তি করিনি। ভেবেছিলাম চাকরি-বাকরি যেমনই হোক, মাথার ওপর একটা ছাদ তো আছে। তো ওই ছাদটুকুই শুধু রইল।

—কেন, তোর ছেলে? বললি যে মায়ে-পোয়ে থাকিস?

—তিনি তো গুণে অষ্টরম্ভা। বাবাও হাঁটা দিল, তারও ডানা গজাল। ও মারা যাওয়ার পর কোম্পানি তো প্রায় কিছুই দেয়নি। তার থেকেই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে....সকাল-বিকেল টিউশানি করে ...ছেলের পড়াটা চালাচ্ছিলাম। তা বাবুর কী মতিভ্রম ঘটল, বেছে বেছে কুসংসর্গেই পড়ল। কলেজের গণ্ডিটা পর্যন্ত টপকাল না।

—কত বড় সে এখন?

—যথেষ্ট ধাড়ি। বাইশ পুরে তেইশ। এখন মাথায় ভূত চেপেছে, লটারির দোকান দেবে। তার জন্যেও তো পুঁজির দরকার। কোথায় পাই বল্ তো?

দুঃখের এমন ধারাবাহিক বিবরণী শোনার অভ্যেস নেই নয়নিকার। এবার বেশ অস্বস্তিই বোধ করছে সে। ঢক-ঢক মাথা নেড়ে বলল,—হুম, সমস্যা।

সুপ্রিয়া চুপ একটুক্ষণ। তারপর হঠাৎই বলল,—এক গ্লাস জল খাওয়াবি?

—নিশ্চয়ই। নয়নিকাও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে,—ইশ, আমি যে কী না...তোকে এখনও চা'টাও অফার করা হয়নি!

—না না, ঠিক আছে। সুপ্রিয়াও হাসছে,—আমি তোকে সে সুযোগ আর দিলাম কই! এসে ইস্তক তো নিজের ঝাঁপি খুলে বসেছি।

—কী খাবি? চা? না কফি?

—যা হয়। আমার কোনো বাছাবাছি নেই। শুধু চিনিটা চলবে না।

—একটু বোস। এক্ষুনি আসছি।

নয়নিকার ডাইনিং হলও একতলাতেই। তবে বসার ঘরের লাগোয়া নয়। সুবিধে হয় বলে রান্নাঘরের পাশেই খাওয়ার জায়গা বানিয়েছে সৌমাল্য। অন্দরে এসে নয়নিকা ভাবল দু'দণ্ড। চায়ের সঙ্গে কী দেওয়া যায়? ফিশফ্রাই বোধহয় গড়া আছে, শিবুর মাকে ভেজে দিতে বলবে? হ্যাঁ, মিষ্টি তো বারণ, নোন্‌তাই ভালো।

শিবুর মাকে নির্দেশ দিয়ে আবার দু'দণ্ড ভাবল নয়নিকা। খুঁজে খুঁজে বাড়ি বার করে সুপ্রিয়া আজ হঠাৎ এল কেন? কিছু সাহায্য চায় কি? নইলে এসেই নিজের নিষ্ফলা জীবনের উপাখ্যান কেন শোনাবে? হ্যাঁ তাই, এবার নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা চাইবে। স্কুলে সুপ্রিয়া তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না কোনও দিনই, তবু বাড়ি বয়ে এসেছে যখন, নয়নিকা কি কিছু দিয়ে দেবে? দেওয়াই যায়। নয়নিকা দিতেই পারে। তবে একবারই, বার বার নয়। এখানে হাত পাতলেই ঝরঝর টাকা ঝরবে, এমন অলীক ধারণা যেন সুপ্রিয়ার না জন্মায়।

মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে ড্রয়িংহলে ফিরল নয়নিকা। ট্রেতে জলের গ্লাস নিয়ে। ঢকঢক জলটুকু শেষ করল সুপ্রিয়া। ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখতে দেখতে বলল,—তুই ঘরটাকে কী সুন্দর করে সাজিয়েছিস রে।

শুধু ড্রয়িংহল নয়, নয়নিকার গৃহের সর্বাঙ্গই সুসজ্জিত। সোফায় হেলান দিয়ে বসে নয়নিকা বলল,—আমার কোনো ক্রেডিট নেই, সব ইন্টিরিয়ার ডেকরেটারের কেরামতি।

—প্রচুর খরচা করেছিস, না রে?

—তা একটু হয়েছে।

—অবশ্য তোদের কি আর টাকার অভাব। তোর বর অত নামকরা ডাক্তার...আর তোর তো খ্যাতির সীমাপরিসীমা নেই। সুপ্রিয়ার চোখ পিটপিট,—দুজনে মিলে প্রচুর রোজগার করিস, না রে?

এভাবে কেউ বলে নাকি। নয়নিকা বিরক্ত হতে গিয়েও সামলে নিল,—

যতটা আসে, অতটা থাকে না। ইনকাম ট্যাক্সই তো অর্ধেক গিলে নেয়।

সুপ্রিয়া যেন শুনতেই পেল না। আপন মনে বলে চলেছে,—তোকে নিয়ে আমার ভীষণ গর্ব হয়, জানিস। আমি তো ডেকে ডেকে সব্বাইকে বলি, স্বনামধন্য গায়িকা নয়নিকা দত্ত আমার বন্ধু। ক্লাস ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়েছি। স্কুলের ফাংশানে ওর গান শুনে আমরা মোহিত হতাম। তখনই বুঝেছিলাম, ও একদিন ফেমাস হবেই।

এই ধরনের স্তুতিবাক্য নয়নিকার কান সওয়া এখন। রেকর্ডটা বাজিয়ে সুপ্রিয়া টাকা চাওয়ার উপক্রমণিকা করছে কি?

ফিশফ্রাই আর চা এসে গেছে। নয়নিকা আলগাভাবে বলল,—নে, খেয়ে নে।

—এত কিছু কী দিয়েছিস?

—কোথায় এত? দুটো তো মাত্র ফিশফ্রাই। প্রথম দিন আমার বাড়িতে এলি...

বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। সুপ্রিয়া টেনে নিয়েছে প্লেট। খাচ্ছে গোগ্রাসে। দেখেই বোঝা যায়, এই ধরনের খাদ্য জোটে না বড় একটা। আহা রে।

নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে নয়নিকা নরম গলায় বলল,—আর খাবি?

—না না, এতেই হয়তো অম্বল হয়ে যাবে। রাত্তিরে কিছু খেতে পারব না। বলল বটে, তবে সুপ্রিয়ার চোখেমুখে সোনালি পরিতৃপ্তি। চায়ের কাপ হাতে তুলে ফের প্রশ্ন ছুঁড়েছে,—হ্যাঁ রে নয়নিকা, ওই র‍্যাকের প্রাইজগুলো নিশ্চয়ই তোর?

—উঁহু। আমার অ্যাওয়ার্ড সব বাঁদিকের র‍্যাকে। ওগুলো আমার মেয়ের প্রাইজ। টেবিলটেনিসে পেয়েছে।

—দ্যাখো কাণ্ড, আসল কথাটাই এখনও জানা হয়নি। সুপ্রিয়া যেন সামান্য অপ্রস্তুত,—তোরও কি একটিই?

—হুম্।

—টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন?

—ওই খেলে আর কি।

—কী পড়ছে?

—ইঞ্জিনিয়ারিং। খড়গপুরে।

—ও মা, তাই? সুপ্রিয়ার চোখ পলকে উদ্ভাসিত। পলকেই নিবে গেছে

যেন। কেমন একটা মিয়োনো স্বরে বলল,—একেই বলে কপাল। ভগবান যাকে দেয়, উজাড় করে দেয়। অবশ্য তুই যা গুণী মেয়ে, এসব তো তোর প্রাপ্যই। তুই তো লেখাপড়াতেও...

ফের বন্দনাগান! ভেতরে ভেতরে একটা অহংকার জাগছিল নয়নিকার। আবার খানিক অস্থিরও লাগছে যেন। এত ধানাই-পানাই করে কেন সুপ্রিয়া? স্তাবকতার উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে ফেললেই তো পারে!

সুপ্রিয়াকে প্রকৃত প্রসঙ্গে পৌঁছে দিতে চাইল নয়নিকা। গলা ঝেড়ে বলল,—আমার কথা ছাড়। ছেলেকে নিয়ে কী ভাবছিস, সেটাই বল্।

—ও তো ভাবাভাবির বাইরে রে। টাকা টাকা করে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। একটা-দুটো গয়না আমার টিকে আছে, বাবুর এখন সেই দিকেই নজর।

—গয়না বেচলে দোকান করার টাকা উঠবে?

—হয় কখনও? সুপ্রিয়া মলিন হাসল,—দাদাকে গিয়ে বলেছিলাম, সে তো একরকম হাঁকিয়েই দিল। বলে, তারই নাকি সংসারের নাভিশ্বাস উঠছে।

—তাহলে কী করবি?

—দেখি। গয়না কটা বাঁধা দিয়ে যেটুকু আসে...তার সঙ্গে কিছু ধার-ধোর...

—শোধ করবি কী করে?

—আরও কয়েকটা টিউশনি ধরব।

—শরীরের যা হাল...পারবি?

—না পেরে উপায় কী।...একান্তই যদি না পারি, তখন ছেলে বুঝবে। বলতে বলতে উঠে পড়েছে সুপ্রিয়া,—চলি রে। তোকে আজ খুব জ্বালিয়ে গেলাম।

নয়নিকা বলেই ফেলল,—দরকার হলে আবার আসিস।

—অদরকারে আসব না? অবশ্য তুই ব্যস্ত মানুষ, এসে মিছিমিছি তোর সময় নষ্ট করা...

—তা ঠিক নয়। আসলে কখন থাকি, কখন থাকি না...। নয়নিকাও উঠেছে,—এলে একটা ফোন করে আসিস।

—আসব। তোর সঙ্গে কথা বলে আজ কী ভালো যে লাগছে! সুপ্রিয়ার চোখে আচমকাই এক চোরা কৌতুক,—ওই যাঃ, ভুলে যাচ্ছিলাম।...তোর কাছে একটা জিনিস চাইব, দিবি?

—কী রে?

—তোর গানের একটা সিডি। ওপরে আমার নামটা লিখে দিবি কিন্তু।

সুপ্রিয়া অনাবিল হাসছে,—ছেলের সঙ্গে আমার বাজি হয়েছিল। ও বলছিল, তুই নাকি আমায় পাত্তাই দিবি না। ওকে গিয়ে দেখাই...

আশ্চর্য গুমোর তো! ভাঙে, তবু মচকায় না! স্রেফ একটা সিডি নিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে হাসিমুখে!

নয়নিকা দরজায় স্থির দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়াকে দেখছিল। নভেম্বরের শেষ, হালকা ঠাণ্ডা নেমেছে শহরে। হিম পড়ছে অল্প অল্প। খানিকটা গিয়ে সুপ্রিয়া ব্লাউজের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা পার্স বের করল। খুলে দেখছে কী যেন। পার্স ফের বুকের খাঁজে চালান করে আষ্টেপৃষ্ঠে গায়ে জড়িয়ে নিল আঁচল। ফের হাঁটা শুরু করেছে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে নীলাভ কুয়াশায়।

নয়নিকারও কেমন শীত শীত করছিল্। হঠাৎই।

ভালবাসা অথবা...

বাড়ি ফেরার পথে মনস্থির করে ফেলল অরূপ। অনেক হয়েছে, আর নয়, আজই কথাটা বলে ফেলতে হবে শান্তাকে। বলতেই হবে। কতদিন আর এ ভাবে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায়! এবার একটা এসপার ওসপার দরকার।

ছুটন্ত মিনিবাস এখন ভিড়ে ভিড়। একটু আগেও অরূপ যখন স্ট্যান্ড থেকে উঠছিল তখন বেশ ফাঁকা ছিল বাস, বসার জায়গাও ছিল কিছু, পার্ক স্ট্রিট ছাড়াতে না ছাড়াতে মানুষ উপচে পড়ছে, কটু ঘামের গন্ধে বিজবিজ চারদিক। কদিন ধরে গরমও পড়েছে খুব, জানলায় বসেও যেন ঠিক আরাম হচ্ছিল না অরূপের। কসরত করে পকেট থেকে রুমাল টেনে বার করে মুখ মুছল অরূপ। এখনও রুমালে গন্ধটা লেগে আছে। কস্তুরীর সুবাস। হয়তো বা চোখের জলও। অরূপ কাছে থাকলে কস্তুরী নিজের রুমাল ব্যবহার করে না, অরূপেরটাই তার চাই।

চোখ বুজে কস্তুরীকে চোখে আনল অরূপ। মেয়েটা এখনও বড্ড ছেলেমানুষ। বাচ্চা মেয়ের মতো কারণে অকারণে হাসি, কথায় কথায় অভিমান, একটুতেই খুশি, দ্যাখ না দ্যাখ চোখ টলটল। কে বলবে কস্তুরীর ভেতরে অত চাপা কষ্ট আছে! কোনও এক মোদো মাতালের সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল, অতিষ্ঠ হয়ে এক বছরের মধ্যে তাকে ছেড়ে চলে এসেছে, ডিভোর্স নিয়েছে, মনের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, চাকরি বাকরি করছে...

নাকি কষ্টটা আছে, অরূপকে পেয়ে সব ভুলে থাকে কস্তুরী? নিশ্চয়ই তাই। অরূপই তো তাকে প্রথম ভালবাসতে শেখাল, নতুন করে স্বপ্ন দেখাল, জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনল আবার। অরূপই তো এখন কস্তুরীর সব থেকে বড় আশ্রয়।

তবু আজ কস্তুরী দুম করে বলে বসল কেন? হঠাৎ আজ এ কথা মনে এল কেন?

—অফিসে সব জানাজানি হয়ে গেছে। মাধবীদি আজ জিজ্ঞেস করছিল, তোদের এই সম্পর্কের পরিণতি কী?

—তুমি কী বললে?

—কী বলব? আমিও তো নিজেই জানি না। কস্তুরী আঙুলে পাকাচ্ছিল অরূপের রুমালটাকে, হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, ডিভোর্সি মেয়ে আমি, আমায় নিয়ে কত লোকে কত কথা বলে...মাধবীদি বলছিল, অরূপ দাশগুপ্ত বউ বাচ্চা ছেড়ে কখনওই তোকে বিয়ে করবে না। দেখে নিস, খেলাবে।

অরূপ গুম হয়ে গিয়েছিল, তোমারও কি তাই বিশ্বাস? তোমারও কি মনে হয় আমি তোমায় খেলাচ্ছি?

—আমি কি তাই বলেছি? অফিসে সবাই যা বলাবলি করে...

—বলুক যে যা খুশি। সকলের মুখের ওপর আমরা ঠিক একদিন জবাব দিয়ে দেব, দেখো। অরূপ একটুখানি দম নিয়ে বলেছিল, তুমি তো জানো আমি তোমাকে কী ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি...। আর কটা দিন সময় দাও আমায়, প্লিজ।

রানিকুঠী এসে গেছে, হাঁকাহাকি করছে কণ্ডাক্টর। পকেটে রুমালখানা গুঁজে অরূপ উঠে পড়ল। ভিড় ঠেলে এগোল গেটের দিকে। সামনেই মা'র হাত ধরে একটা বাচ্চা ছেলে, ভিড়ের চাপে ছটফট করছে বেচারা। একদম বাবুনের বয়সি। অরূপ টপকে যেতে গিয়েও কী ভেবে ছেলেটার হাত ধরে ফেলল, সাবধানে নামিয়ে দিল বাস থেকে। ছেলেটার মা ধন্যবাদ গোছের কিছু বলল যেন, অরূপের কানে গেল না। অন্যমনস্কভাবে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাবুনের জন্য কী যেন একটা কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল না শান্তা? কী যেন? রঙ পেনসিল? স্টিকার? চার্টপেপার? মনে পড়ছে না। থাক, শান্তা নিজেই কিনে নেবে। বাবুনকে যদি শান্তা না ছাড়ে, যদি জোর করে নিয়ে চলে যায়, তখন তো ছেলের জিনিস তাকেই কিনতে হবে। এখন থেকেই বরং অভ্যেসটা হোক। ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে উঠল অরূপের। সাড়ে চার বছরের বাবুন তার বড় আদরের। শান্তাকে নয় ছেড়ে দিতে পারবে অরূপ, কিন্তু বাবুন? ওদিকে আবার ছেলে না দিলে শান্তাই বা থাকে কী নিয়ে? সমস্যা। সমস্যা। একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা যায়। বাবুন নয় মা'র কাছে কিছুদিন রইল, কিছুদিন বাবার....। শান্তা কি রাজি হবে?

যাক গে যাক, তখনকার ভাবনা তখন। আগে শান্তাকে তো ছাড়া যাক। অরূপ মন্থর পায়ে হাঁটা শুরু করল। হঠাৎ কোত্থেকে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করেছে শরীরে। অফিস ছুটির পর প্রতিদিন সে আর কস্তুরী গিয়ে বসে থাকে গঙ্গার ধারে। নদীর স্নিগ্ধ বাতাস আর কস্তুরীর টাটকা নিশ্বাস সঞ্জীবনী হয়ে সপ্রাণ করে দেয় তাকে। আজও তো ছিল, খানিক আগেও। তবু কেন এত ক্লান্তি?

তবে কি কস্তুরীর কথা শান্তাকে বলতে হবে বলে মনে মনে টেনশন হচ্ছে অরূপের?

ধুস, কীসের টেনশন? সত্যি কথাটা বলতে অরূপ মোটেই ঘাবড়াবে না।

বাড়ির দরজায় এসে অরূপ বেল টিপল। অন্য দিনের মতো জোরে জোরে নয়, বেশ আস্তে। যেন কোনও অপরিচিত বাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

শান্তা দরজা খুলেছে, এসেছ? দ্যাখো, দিদি কতক্ষণ ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

দিদি মানে অরূপেরই দিদি। কাছেই থাকে, বাঁশদ্রোনীতে। অরূপের বিয়ের পর ভাইকে কাছাকাছি রাখবে বলে নিজে এই বাড়িটা দেখে দিয়েছিল দিদি। আগে রোজই আসত, ইদানীং ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর চাপে উপস্থিতি একটু কমেছে।

অরূপ ঢুকতেই দিদি বলল, হ্যাঁ রে, তুই নাকি আজকাল রোজ এই সময়ে বাড়ি ফিরিস? কী করিস এতক্ষণ অফিসে?

অরূপ গম্ভীর মুখে বলল, কাজ থাকে। ওভারটাইম।

—তাই বল। তা এই যে রোজ রোজ এত ওভারটাইম করছিস, এক্সট্রা পয়সাগুলো জমাচ্ছিস তো?

—যেটুকু পারি জমাই।

—হ্যাঁ জমা। কদিন আর ভাড়া বাড়িতে থাকবি, এবার একটা ফ্ল্যাট ট্যাট বুক করার কথা চিন্তা কর।

শান্তা রান্নাঘরে ঢুকে গেছে, চায়ের জল বসাচ্ছে বোধহয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, ওই কথাটাই তোমার ভাইকে একটু ভাল করে বোঝাও তো দিদি। এইটুকু টুকু দু'খানা ঘরে মাথা গুঁজে আছি, জল নিয়ে বাড়িঅলার সঙ্গে নিত্য অশান্তি, দরকারে দেওয়ালে একটা পেরেক পুঁততে গেলেও অবিনাশবাবু ওপর থেকে হাঁ হাঁ করে নেমে আসে...

অরূপ মনে মনে বলল, তোমার অশান্তি যাবে না শান্তা। ফ্ল্যাট হয়তো

একদিন আমার হবে, কিন্তু সে ফ্ল্যাট তোমার হবে না।

মুখে বলল, আমি ভাবি না কে বলল? কত প্রোমোটারের সঙ্গে কথা বলেছি জানো? স্যুটেবল একটা পেয়ে গেলে অফিস থেকে লোন নিয়ে....

—খুউব ভাল। করতে হলে এই বয়সেই করে ফ্যাল। তোর জামাইবাবু তো কিছুই পেরে উঠল না, তোদের হলে আমারও ভাল লাগবে।

দিদির স্বরে হালকা বিষাদ। দুঃখবিলাস। জামাইবাবুদের নিজেদের অত বড় বাড়ি, তবু আপনি কোপনি হয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারেনি বলে হাহাকার।

অনর্থক কথা বাড়াল না অরূপ। মেঝেয় বসে ছোট ছোট পিসবোর্ডের টুকরো জোড়া লাগিয়ে ছবি বানাচ্ছে বাবুন। পশু পাখি মাছ ফুল পাতা। ছেলেটা বড় শান্ত, নিজের ছোট্ট জগতে তন্ময় হয়ে থাকে দিন রাত। অরূপ ঝুঁকে ছেলের কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে হাত বোলাল একটু। তারপর ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে ঢুকে গেল বাথরুমে।

বাথরুমটা বেশ মলিন। স্যাঁতসেঁতে। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে বাড়িঅলা শাওয়ার লাগিয়ে দেবে বলেছিল। দেয়নি। চৌবাচ্চা ব্যাপারটাকে বড় স্থূল মনে হয় অরূপের। তবু উপায় কী, শান্তার মতো রসকষহীন নারীকে সে যখন এতদিন সহ্য করেছে, এই চৌবাচ্চাকেও না হয় আর কিছুদিন...। হড়াস হড়াস গায়ে খানিকটা জল ঢালল অরূপ। কস্তুরী মোটেই শান্তার মতো ঘরে বসে থেকে শুকিয়ে যাওয়ার মেয়ে নয়, দুজনের রোজগারে দিব্যি একটা আধুনিক ফ্ল্যাট বানানো যাবে, মনের মতো করে। কস্তুরীর রুচিও আছে, ভারি শৌখিনভাবে সাজাবে ফ্ল্যাটখানা।

...কিন্তু শান্তাকে কথাটা বলা যায় কেমন করে? ঝপ্ করে বলে দেবে? আকস্মিক আঘাতে বিবর্ণ হয়ে যাবে কি আটপৌরে শান্তা?

গায়ে সাবান ডলল অরূপ, চেপে চেপে সারাদিনের ক্লেদ তুলছে দেহ থেকে। রয়ে সয়েও বলা যায়, যাকে কিনা বলে ধীরে ধীরে ভাঙো। এ কথা সে কথার মাঝে অল্প আভাস ইঙ্গিত দিয়ে, তারপর পুটুস করে এক সময়ে...। শান্তা কি শুনেই খুব ভেঙে পড়বে? নাকি রেগে মেগে...?

তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে আবার একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলল অরূপ। বেচারা শান্তা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অরূপ দেখল দিদি চলে যাচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে শেষ আলাপ সারছে শান্তা। অরূপ একটু নিশ্চিন্ত হল। যাক, এবার শান্তাকে একলা পাওয়া যাবে। শোওয়ার ঘর থেকে চুল টুল আঁচড়ে সোফায়

এসে বসল অরূপ। নিঃশব্দে চা খেয়ে একখানা সিগারেট ধরিয়েছে। নীলচে সাদা ধোঁয়া পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

বাবুন এখন টিভিতে মগ্ন। কার্টুন ফিল্ম। চলমান ছবি দেখে কখনও হেসে উঠছে আপন মনে, কখনও বা চোখ বড় বড়।

অরূপ ছেলেকে ডাকল, কী রে বাবুন, তুই আমার সঙ্গে একটাও কথা বললি না যে?

—বা রে, তুমি তো পিসির সঙ্গে কথা বলছিলে।

—এখনও তো বলছিস না!

—বা রে, কার্টুন দেখছি যে।

অরূপ বলতে চাইল, আমাকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো বাবুন? স্বর ফুটল না। ছেলের ওই নিমগ্ন ঘোর ভাঙিয়ে দেওয়া বড় নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে না কি?

শান্তা পাশে এসে বসেছে। ছেলেকে বলল, তুমি কিন্তু সন্ধে থেকে একটুও পড়াশুনো করলে না বাবুন।

বাবুনের চোখ টিভিতে স্থির, বা রে, বিকেলে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর লিখলাম।

—ব্যস? আর রাইমস মুখস্থ করবে কে?

—সব রাইমস আমি জানি।

—বল তো দেখি।

—উঁ উঁ উঁ...বাবুন শরীর মোচড়াচ্ছে।

অরূপ ইঙ্গিতময় সুরে বলে উঠল, ছেলে নিয়ে তোমায় অতো চিন্তা করতে হবে না। বাবুন খুব ইন্টেলিজেন্ট, ও ঠিক শাইন করবে দেখো।

—যত ইন্টেলিজেন্টই হোক, ঘষামাজা না করলে কিছু হয় না।

—সব হয়ে যাবে। ভেবো না।

—তোমার তো খালি ওই এক কথা। সামনের বছর ওকে হাইস্কুলে দিতে হবে সে খেয়াল আছে?

—দিও।

—কোন স্কুলে চেষ্টা করা যায় বলো তো?

—তুমি কোন স্কুলে দিতে চাও?

—আমার তো বাবা সেন্ট পিটারসই বেশি পছন্দ।

শখ কী, বাপস! ওই স্কুলে ভর্তি করাতে কম সে কম পঁচিশ হাজার টাকার

ধাক্কা। তাও যদি ধরে করে চান্স পাওয়া যায়। তারপর মাস মাস শ পাঁচেক টাকা টিউশন ফি। শান্তা অত টাকা পাবে কোত্থেকে? অরূপের কাছ থেকে অ্যালিমনি চাইবে? চাইতেই পারে। শান্তার যতদিন না কোনও কাজকর্ম জোটে খোরপোষ তো তাকেই দিতে হবে। তাছাড়া বাবুনকে বড় করার দায় যে অরূপেরও আছে এ কথা সে অস্বীকারই বা করে কী করে!

এখনই কি কথাটা বলে ফেলবে শান্তাকে? এটাই বোধহয় প্রকৃষ্ট সময়। অরূপ মনে মনে শুরুটা ভেঁজে নিল, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল শান্তা।

—কী কথা?

—কথাটা একটু সিরিয়াস। তোমায় একটু ঠান্ডা মাথায় শুনতে হবে।

পলকের জন্য ভুরুতে ভাঁজ পড়ল শান্তার, পলকে মিলিয়েও গেল। সহজ স্বরে বলল, সত্যি সত্যি কোথাও ফ্ল্যাট বুক করছ?

—না।

—তাহলে? অফিসের কোনও প্রবলেম?

—না। অরূপ সামান্য অধৈর্য, অন্য কথা।

—তাহলে পরে বোলো। আমি আগে বাবুনের খাবারটা গরম করে আনি। উঠে রান্নাঘরে যেতে গিয়েও দাঁড়াল শান্তা, তুমি রুটি খাবে, না ভাত?

অরূপ হতাশ। চোখ বুজে ফেলে বলল, রুটিই করো।

কাজের পর কাজ চলছে শান্তার। বাবুনকে খাওয়ানো রীতিমতো কঠিন কর্ম, অনেক সাধ্যসাধনা করে নরমে গরমে সেই পাট চোকালো আগে, খান আষ্টেক রুটি বানালো, ফ্রিজের হিমায়িত খাবার গরম করার জন্য বার করল একে একে, কাল সকালে কাজের লোকের জন্য মেপেজুপে মশলা বের করে রাখল গ্যাসস্টোভের পাশে, গরমে দুধ কেটে যায় বলে আবার একবার দুধ জ্বাল দিল, তারপর নৈশাহার সাজাচ্ছে টেবিলে। অরূপের সিরিয়াস কথা শোনার তার সময় কোথায়!

নাহ্, খেতে বসেও কথাটা পাড়া গেল না। রোজ রোজ বাজার থেকে অরূপ পটল আনছে বলে উষ্মা প্রকাশ করল শান্তা, কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বাজারদরের ফিরিস্তি শোনাতে হল অরূপকে। ঝুপ্ করে প্রসঙ্গ পাল্টে শান্তা ইলেকট্রিক বিলে চলে গেল, সেখান থেকে ভায়ের বিয়ের গল্পে। শ্রাবণে বিয়ে ঠিক হয়েছে শান্তার ভায়ের, বউকে একটা গয়না না দিলেই নয়, তাই নিয়ে... অরূপ ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ছিল। কথাটা কি তবে আজও বলা হবে না?

রাতে রান্নাঘর টান্নাঘর গুছিয়ে শান্তা যখন শোওয়ার ঘরে এল, বাবুন তখন ঘুমে কাদা, অরূপ হাতের পিঠে চোখ ঢেকে বিছানায় আধশোয়া। ভাবছে। ভাবছে।

কস্তুরীকে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে। বাসতেই পারে। বউ বাচ্চা আছে বলে কি অরূপের আর কাউকে ভালবাসার অধিকার নেই? একজনকে ভাল লাগছে, আরেকজনকে লাগছে না, যাকে ভাল লাগছে তার সঙ্গে ঘর করার চিন্তা পাপ? অন্যায়? সমাজ চোখ রাঙাবে? ধুস, অরূপ সমাজকে কেয়ার করে না। কস্তুরী মিশে গেছে তার অস্তিত্বে, কস্তুরী বিনা বাঁচা এখন তার পক্ষে অসম্ভব।

শান্তা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আঁটসাঁট করে চুল বাঁধছে। আড়চোখে অরূপ দেখছিল শান্তাকে। কস্তুরীর জায়গায় শান্তাকে একদমই ভাবা যায় না। তুলনাই হয় না। জিরো। জিরো। কী কাঠখোট্টা চেহারা হয়েছে শান্তার! খসখসে অনুজ্জ্বল চামড়া, টিকটিকির লেজের মতো চুল, গালে মেচেতার দাগ, রোগা হতে হতে বুক পিঠ সমান! সে জায়গায় কস্তুরী তো রাজহংসী। শুধু বাবুনের মা বলে কি শান্তাকে আর সহ্য করা সম্ভব?

মন থেকে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল অরূপ। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল, শোন!

দাঁতে কালো ফিতে চেপে ঘুরে তাকাল শান্তা, কী?

—তখন যেটা বলছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার সত্যিই একটা জরুরি কথা আছে।

—আমারও।

অরূপ চোখ কুঁচকোল, তোমার আবার কী কথা?

—দিদি সন্ধেবেলা কেন এসেছিল জানো? জামাইবাবুর কোম্পানির হাল নাকি খুব খারাপ। যাকে তাকে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্টের নোটিস ধরিয়ে দিচ্ছে।

—সে কী? প্রশ্নটা করতে না চেয়েও করে ফেলল অরূপ, দিদি তো আমায় তখন কিছু বলল না?

—বলবে তো বটেই। আজ বলেনি, সবে তখন তুমি খেটেখুটে এসেছ...।

—রিটায়ার করিয়ে দিল, টাকাপয়সাও নিশ্চয়ই দিয়েছে....

—জানি না। তবে.....দিদি বলছিল খুব বিপদ.....

—কিছু তো পাবেই। একটা ব্যবসা ট্যবসা শুরু করতে পারে।

—হুম।....তুমি কী বলবে বলছিলে?

—বলছি। আগে বিছানায় এসো।

কথাটায় কি অন্য কোনও আহ্বান আছে ধরে নিল শান্তা? চুপচাপ খাটে এসেছে। বাবুনকে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে মাঝখানে নিজের জায়গা করে নিল। সায়ার দড়ি আলগা করল, ব্লাউজের হুকগুলো খুলে দিলো পুটপুট। গরমে এ

ভাবেই শিথিল হয়ে শোয় শান্তা। অরূপ অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। চোখ বুজে বলল, আচ্ছা শান্তা, আমি যদি আর তোমাদের সঙ্গে না থাকি? ধরো যদি চলে যাই?

শান্তা শুতে যাচ্ছিল। থমকে গিয়ে বলল, ও আবার কী কথা? কোথায় যাবে?

—ধরো, রইলাম না....তুমি একা একা বাবুনকে মানুষ করতে পারবে তো?

—রাতদুপুরে কী উৎপটাং কথা শুরু করলে, অ্যাঁ? শান্তা চোখ পাকাল, এই তোমার দরকারি কথা?

—না না, সিরিয়াসলি বলছি। জীবন তো একই রকম নাও থাকতে পারে। কত কিছুই তো হয়ে যেতে পারে। পারে না?

—যখন হবে তখন ভাবব। শান্তা তবু নির্বিকার, হঠাৎ আজ এমন উল্টোপাল্টা চিন্তা মাথায় আসছে কেন?

—উল্টোপাল্টা নয়, ভাবছিলাম। অরূপ মরিয়া হল, ধরো, আমার একটা অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে রিলেশান হল, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে গেলাম?

শান্তা মুহূর্তের জন্য স্থির। পরক্ষণে খিলখিল হেসে উঠেছে, ইশ, সে মুরোদ তোমার আছে নাকি? আমি তো বেঁচে যাই তাহলে। বলতে বলতে হঠাৎই ঝুঁকেছে। অরূপের খোলা পিঠে আঙুল রেখে বলল, এই তোমার কী হয়েছে গো?

অরূপের সব কথা গুলিয়ে গেল। হতচকিত স্বরে বলল, কী হয়েছে?

—এ মা, একেবারে চাপড়া চাপড়া হয়ে গেছে। এগ্‌জিমার মতো। শান্তা হাত বোলাচ্ছে পিঠের মাঝখানটায়, আগের বারও গরমে ঠিক এ রকম হয়েছিল। কী গো তুমি? টের পাও না? জ্বালা করে না?

ফোঁস্ করে একটা লম্বা শ্বাস ফেলল অরূপ, করে। মাঝে মাঝে।

—একটু মলম লাগিয়ে দেব?

—দাও।

আঙুল নড়ছে পিঠে? না যাদুকাঠি? অরূপের কেমন যেন বিবশ লাগছিল নিজেকে। বিবশ? না অসহায়?

নাহ্, আজও কথাটা বলা গেল না। কালও কি পারবে অরূপ? পরশু? তরশু?

অরূপ টের পাচ্ছিল, ভালবাসি বলার থেকেও ভালবাসি না বলাটা অনেক অনেক বেশি কঠিন।

কেন যে কঠিন?

নখ

পর পর তিন রাত একই স্বপ্ন দেখল প্রীতম। এক পুরুষ আর এক নারী..... হ্যাঁ নারী পুরুষই বলা যায় তাদের। পুরুষটি রীতিমত সুদর্শন, দামী পোশাক পরা, মসৃণভাবে কামানো দাড়ি গোঁফ, গলায় ঝকঝকে টাই। প্রথমে লোকটা একাই উদয় হচ্ছে। মেয়েটা কয়েক সেকেন্ড পর ট্রিক শটের মত এসে দাঁড়াচ্ছে তার পাশে। স্বপ্নে রঙ ঠিক বোঝা না গেলেও প্রীতম লক্ষ করেছে মেয়েটাও খুব ঝলমলে সাজে সেজে থাকে। দামী শাড়ির আঁচল হওয়ায় ভাসিয়ে মৃদু মৃদু দোলে মেয়েটা। তারপর অবিকল বিজ্ঞাপনের ছবির মতো শ্লো মোশান হয়ে ধীর পায়ে চলে আসে তার কাছে। খুব কাছে। টাটকা মুখে হাল্কা ক্রিমের মতো ছড়িয়ে থাকে মন মাতানো হাসি। এগিয়ে এসে প্রীতমের বুকে আলতো হাত রাখে সে। প্রীতমের গা শিরশির করে ওঠে। কেমন বিবশ হয়ে সে চোখ বুজে ফেলে। কিন্তু তারপর চোখ খুললেই ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য। রূপকথার নারীপুরুষ পলকে মোহন রূপ পাল্টে ফেলেছে। কান্তিময় পুরুষটির গোটা শরীরভর্তি বনমানুষের মতো ঘন কালো লোম। দু চোখ আগুনের ভাঁটা। একপাটি দাঁত উৎকটভাবে ঝুলে পড়েছে ঠোঁট বেয়ে। মেয়েটিরও মোম শরীর ঢেকে গেছে মোটা মোটা লোমে। চুল উড়ছে রাক্ষসীর মতো। টকটকে লাল ঠোঁট বেয়ে তাজা রক্ত গড়াচ্ছে। প্রীতম ভয়ে চিৎকার করে ওঠার আগেই ওরা তাকে জাপটে ধরে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো আঙুল তার চোখের সামনে কিলবিল নাচায়। কী বিশ্রী বড় বড় নখ যে তাদের হাতে! নখ নয়, যেন বুনো শুয়োরের দাঁত। সেই নখ দিয়ে ওরা আস্তে আস্তে চিরতে শুরু করে প্রীতমকে। বুক চেরে। পেট চেরে। দেহ, মুখ, হাত, পা ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। প্রীতম গলা ফাটিয়ে কাউকে ডাকার চেষ্টা

করে। পারে না। ওরা ওর স্বরযন্ত্রটা নখের ছুঁচোলো খোঁচায় ফুটো করে দেয়। পুরো শরীর ফালা ফালা করার পর ওরা প্রীতমের চোখে নখ ঢোকায়। উন্মত্ত উল্লাসে খুবলে তুলে নেয় দুটো চোখই। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে প্রীতমের ঘুম ছুটে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ খোলার পর প্রথমে মনে হয় সত্যিই তার চোখ জোড়া আর নেই। সারা জীবনের মতো অন্ধ হয়ে গেল সে। বিছানায় বসে কুকুরের মতো হাঁপায় কিছুক্ষণ। শরীর নিংড়ে ঘাম বেরোয়। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে আগে আঙুল ছোঁয়ায় চোখে। নাহ্, চোখ তো ঠিকই আছে। শুধু কোটরে জমে গেছে চ্যাটচেটে কিছু ঘন রস। ধীরে ধীরে হাত বোলায় গায়ে, হাতে পায়ে। কোথাও কোনও কাটাছড়া নেই।

আশ্চর্য! পর পর তিন রাত ধরে কেন একই স্বপ্ন দেখছে সে? একবার নয়, বার বার। হুবহু একই ঘটনা। এটা স্বপ্ন, না দুঃস্বপ্ন? কি মানে আছে এই স্বপ্নের?

প্রথম রাতে একটু ধাতস্থ হওয়ার পর সে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়েছিল চন্দ্রাকে। চন্দ্রা ধড়ফড় করে উঠে বসেছিল বিছানায়—কি হয়েছে? এত ঘামছ কেন?

—বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। প্রীতমের বুকে তখনও হাপর চলছে।

চন্দ্রা বাথরুম ঘুরে এসে মায়ের মতো গলায় বলেছিল,—যাও, চোখমুখে জল দিয়ে এসো, নির্ঘাত পেট গরম হয়েছে। এত করে বলি বাইরে আজে বাজে জিনিস খেও না, তা শোন আমার কথা?

চন্দ্রার নরম ধমক শুনতে তখন ভালই লাগছিল প্রীতমের। নতুন করে বিছানায় শুয়ে সে জড়িয়ে ধরেছিল বউকে,—কী স্বপ্ন দেখছিলাম জানো?

—পরে শুনব। এখন ঘুমোও দেখি। প্রীতমের চুলে বিলি কেটে দিয়েছিল চন্দ্রা,—ও নিয়ে এখন ভাবতে হবে না।

সকালে অবশ্য চন্দ্রা নিজে থেকেই জানতে চেয়েছিল স্বপ্নটার কথা। প্রীতম তখন তড়িঘড়ি অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ঠোঁট বেঁকিয়ে ছিল,—ও কিছু না। ফালতু ব্যাপার।

রোজকার মতো বাসস্টপে এসে যখন দাঁড়িয়েছিল সে কল্লোলিনী কলকাতা তখন নিয়মমাফিক ব্যস্ততার খোলশ গায়ে এঁটে হাঁস-ফাঁস করছে। হাঁস মুরগি বোঝাই বস্তার মতো বাস ট্রাম মিনি দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। একটা ডবলডেকার গুটি কয়েক মানুষ উগরে দেওয়ার জন্য দাঁড়াতেই টুক্ করে তার খোলের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছিল প্রীতম।

—কী দাদা, ঠেলছেন কেন? দেখছেন না সামনে লেডিজ আছে?

—আমি ঠেলছি কোথায়! পেছন থেকে আমায় ধাক্কা মারছে।

প্রীতম প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল ভিড়ের চাপে নিজেকে টান টান করে

রাখতে। বাসে ট্রামে, রাস্তায় ঘাটে মানুষের মেজাজ আজকাল খেঁকি কুকুরের মতো হয়ে থাকে। কারুর এতটুকু সহ্যশক্তি নেই। ধৈর্য নেই। অন্যকে কেউ এক সেন্টিমিটার জমি ছাড়তেও রাজী নয়। পান থেকে চুন খসলে দাঁত খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ ওর গায়ে। প্রীতমের বড় নোংরা লাগে ব্যাপারটা। সে কোনও সময়েই কোনও ঝামেলায় যাওয়া পছন্দ করে না। গেটের জটলা ছেড়ে ভেতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে।

—এই যে, সোজা হয়ে দাঁড়ান তো। তখন থেকে খালি গায়ে পড়ছেন।

ভদ্রমহিলা যে কথাটা তাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে প্রথমটা বুঝতে পারেনি প্রীতম। সে তখন সামান্য অন্যমনস্ক। বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য বেধে গেছে। বৌ-এর পরামর্শ মতো ভাই এখন ঘটিবাটিরও চুলচেরা ভাগাভাগি চায়। এ সব নিয়ে রেষারেষিতে ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে ভাবতে প্রীতমের বড় কষ্ট হয়। অথচ চুপচাপ মেনে নিলেও সংসারের শান্তি নষ্ট হবেই। চন্দ্রা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে বিয়ের পর থেকে প্রীতমের অনেক বোকামি সে সহ্য করেছে, এখন আর কোনও আপোষ করবে না। বেরনোর আগেও চন্দ্রা পইপই করে বলেছে ফেরার পথে প্রীতম যেন সুনীলের সঙ্গে কথা বলে আসে। সুনীল চন্দ্রার মাসতুতো দাদা। আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস্ করে। চাপ চাপ মানুষের মাঝখানে এক্কেবারে একা হয়ে ভীষণ ভাবে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছিল প্রীতম।

—এই যে মোসাই, ভদ্রমহিলা আপনাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?

—আমি? আমায় বলছেন? প্রীতম আমতা আমতা মুখে চারদিক দেখে নেয় একবার,—আমি তো ধাক্কা মারিনি।

প্রীতমের বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়ানো মহিলাটি ঝনঝনিয়ে ওঠে,—ধাক্কা মারেন নি, অসভ্যতা করছেন।

হায় মা! এ কী বলে রে!

প্রীতম আড়ষ্ট হয়ে যায়,—কিছু মনে করবেন না, দিদি। পেছন থেকে চাপ আসছে। আমি তো যথাসাধ্য ব্যালেন্স রেখেই দাঁড়িয়ে আছি।

ভদ্রমহিলা রুক্ষ্ম চোখে জরিপ করে প্রীতমকে। কোনও অপরাধ না করেও প্রীতমের বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। আশপাশ থেকে নানা রকম অশালীন মন্তব্য শুরু হয়ে গেছে। প্রীতম আড়চোখে একবার মহিলাটিকে দেখে। দেখলেই বোঝা যায় মহিলার শরীর থেকে যৌবন বড় তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে। শুকনো প্যাকাটি চেহারা। এ ধরণের মহিলারাই বাসে-ট্রামে অকারণে অপমান করার

চেষ্টা করে পুরুষদের। হয়তো গোপন কোনও হতাশা থাকে বলেই। অথবা নেহাতই ছুঁৎমার্গতা!

ভিড় থেকে কোনও দরদী কণ্ঠ বলে ওঠে,—যাদের এত ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক, তারা ভিড়ে ওঠেই বা কেন?

কে একজন ফিসফিস করে,—তাও যদি ডবকা মাল হত!

প্রীতম গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়। চোরের মতো নেমে যায় বাস থেকে।

সেদিনই রাতে আবার স্বপ্নটা দেখে প্রীতম। ঘুম ভাঙার পরও চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ চোখ। বেড সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে চন্দ্রাকে এক ঝলক দেখে নেয়। বিশ্রীভাবে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে চন্দ্রা। প্রীতম চন্দ্রাকে ডাকতে গিয়েও ডাকে না। ঘুমোনোর আগে আজ জোর ঝগড়া হয়েছে চন্দ্রার সঙ্গে। চন্দ্রার দাদার বাড়ি হয়ে ফিরতে ফিরতে আজ একটু রাতই হয়েছিল, বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খিটিরমিটির জুড়ে দিল চন্দ্রা,—দুপুরে তোমার বোন ছুটতে ছুটতে এসেছিল। রবিবার তোমাকে বাড়ি থাকতে বলেছে, কী জরুরী দরকার আছে তোমার সঙ্গে।

প্রীতম চুপচাপ প্যান্টশার্ট বদলাচ্ছিল।

চন্দ্রা শুকনো গলায় প্রশ্ন করল,—কি জন্য বোনের দাদাকে এত দরকার শুনতে পারি কি?

—আমি কি করে জানব? তুমি ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে।

—ন্যাকামি কোরো না। তুমি সব জানো।

—হঠাৎ গায়ে পড়ে ঝগড়া করছ কেন?

চন্দ্রা একথায় আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঝগড়ার রেশ চলে শোওয়ার আগে পর্যন্ত।

প্রীতম নিঃশব্দে মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। আবার একই দুঃস্বপ্ন কেন দেখল সে? সত্যি সত্যিই কি তার পেট গরম হচ্ছে? পেট গরম, না মাথা গরম? মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে আবার বিছানায় ফেরে প্রীতম। মশারির চালে ফেলা বেড সুইচ নেবালেই আবার অন্ধকার। স্বপ্নের অস্বস্তিটা কাটাতে প্রীতম আলোটা জ্বালিয়েই রাখে। আচমকা চন্দ্রা ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে তার। চন্দ্রা তবে এতক্ষণ জেগেই ছিল? নাকি আলো জ্বলতে জেগে উঠেছে? প্রীতম কাঠের মতো শক্ত করে রাখে নিজেকে।

চন্দ্রার গলায় আদর ঝরে,—এখনও রেগে আছ?

প্রীতম উত্তর দেয় না।

—দ্যাখো, সারাদিন সংসারের কাজ আর ঝামেলায় মাথা ঠিক থাকে নাগো। আমি তোমাকে ও সব কথা মন থেকে বলতে চাইনি।

প্রীতমের জমাট রাগ গলতে শুরু করে।

—ছেলেটা আজ স্কুলে মারামারি করে একটা ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আন্টিরা একগাদা কথা শোনাল আমাকে। ছেলেটার মাও। তারপর দুপুরে ছোড়দি এসে এমন হেঁয়ালি করে গেল...

—বাবুয়া মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে? কবে থেকে এত মস্তান হয়ে উঠল?

—ওকে বোকো না প্লিজ। আমার কাছে এমনিতেই খুব মার খেয়েছে।

প্রীতম চন্দ্রাকে কাছে টেনে নেয়। তখনই চোখ পড়ে চন্দ্রার হাতের দিকে। চন্দ্রার আঙুলে একটু আগের স্বপ্নে দেখা সেই ধারালো নখ।

—এত বড় নখ রেখেছ কেন?

চন্দ্রা মায়াবী মেয়েটার মতো হাসে,—কী হয়েছে তাতে? অনেক মেয়েই বড় বড় নখ রাখে। আমারগুলো অবশ্য ভাল শেপ করা নেই। স্নিগ্ধা বলেছে সুন্দর ছুঁচোলো করে কেটে দেবে। এই, তুমি আমাকে একটা ফরেন নেলপালিশ কিনে দেবে?

প্রীতম চন্দ্রাকে ছেড়ে দেয়,—তুমি কালই নখ কেটে ফেলবে।

—কেন?

—দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। কেমন জংলী জংলী।

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রাও সরে যায়। ভারী গলায় বলে,—তোমার সব কিছুতেই বেশি বেশি।

—হ্যাঁ, বেশি বেশিই। চন্দ্রাকে চমকে দিয়ে হঠাৎই চেঁচিয়ে ওঠে প্রীতম,—তুমি ওরকম নখ রাখবে না হাতে। ব্যাস।

পর দিন অফিস বেরনো হয় না প্রীতমের। সাত-সকালে বোন নয়, হঠাৎ দিদি এসে হাজির। পল্টুকে কাল রাতে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। প্রীতম অনেক দিন ধরেই এ রকম একটা আশঙ্কাই করছিল। ছেলেটার লেখা পড়ায় মোটেই মন নেই। একটা আঠারো উনিশ বছরের ছেলে, যার চোখে এখন সুন্দর স্বপ্ন থাকার কথা, সেই ছেলে দিন রাত চাকু ভোজালি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বোমাবাজিতে ওস্তাদ। সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে এক মস্তানের চামচা হয়েছে ইদানীং।

দিদি বলল,—তুই একটু থানায় গিয়ে কথা বলে দেখবি?

প্রীতম সামান্যতম গণ্ডগোলও চিরকাল এড়িয়ে চলতে ভালবাসে। তবু

দিদির অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বেরতেই হয় তাকে।

তার পরদিন সকালে প্রীতমের মুখচোখ দেখে চন্দ্রা ঘাবড়ে যায়,—কিগো, কী হয়েছে তোমার? জ্বর-টর এল নাকি?

—নাহ্, ঠিক আছি। কোন গভীর কুয়ার অতল থেকে বুঝি কথা বলে প্রীতম। আবারও হুবহু একই স্বপ্ন কেন এল কাল রাত্তিরেও?

প্রীতমের অফিসের মোহনবাবু জ্যোতিষ-টোতিষ করেন। প্রীতম টিফিনের সময় তার কাছে যায়। স্বপ্ন এভাবে পর পর টানা দেখে যাওয়া মোটেই ভাল লক্ষ্মণ নয়। আপনার কিছু ধারণ করা দরকার। দেখি হাতটা।

হাত বাড়াতেই প্রীতমের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ বয়ে যায়। নিভাঁজ ধুতি পাঞ্জাবী পরা মোহনবাবুর কড়ে আঙুলে হুবহু সেই নখ!

—কী হল?

—উফ্ মোহনদা, আপনার আঙুলে যে রকম নখ আছে, ঠিক এই রকম নখ তাদেরও।

মোহনবাবু চুপসে যান।

প্রীতম ফ্যাস্‌ফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করে,—আপনি নখ রেখেছেন কেন মোহনদা?

—এমনিই শখ। মোহনবাবু গলা ঝাড়েন।

প্রীতম প্রায় ছুটে পালায় মোহনবাবুর কাছ থেকে। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। নিজের চেয়ারে এসে মাথা চেপে বসে থাকে চুপচাপ।

পাশের টেবিলের পুরনো বন্ধু দীপক সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে—কি একটা স্বপ্ন নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছিস বল্ তো? তোর মন এত দুর্বল তা তো জানতাম না!

—না রে, দুর্বলতা নয়, আমি তোদের ঠিক বোঝাতে পারছি না।

—আচ্ছা, যাদের দেখিস তারা দেখতে কেমন?

কোনও চেনা লোকের সঙ্গে মিল নেই। তবে দেখতে তারা প্রথমটা খুব সুন্দরই থাকে। তারপর হঠাৎই...

—শোন্, আমার মনে হয়, তোর অবচেতনে কোনও ভয় কাজ করছে। কোনও একটা ঘটনা বা ছবি তুই দেখেছিস যা তোর মনে খুব গভীরভাবে দাগ কেটে গেছে। সেটাই স্বপ্ন হয়ে ঘুরে ফিরে আসে।

আঁতিপাতি করে খুঁজেও প্রীতম সে রকম কোনও ঘটনা বা ছবির কথা মনে করতে পারে না।

দীপক বলে,—দূর শালা, তিন দিন এক স্বপ্ন দেখে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দে, একটা সিগারেট দে।

প্রীতম শুকনো হাসে। সিগারেটের প্যাকেট দীপকের দিকে বাড়াতে যেতে আবারও জোর হোঁচট,—ইস্ তোর নখগুলোও কী বড় বড়!

হো হো করে হেসে ওঠে দীপক,—কত বড়? তোর স্বপ্নের নখের মতো?

প্রীতম গম্ভীর হয়ে যায়। ফাইল খুলে কাজে মন বসাতে চেষ্টা করে। মন বসে না। সরকারি অফিস। টিফিন শেষ হলেও তার আমেজ এখনও কাটেনি। অনেক টেবিলই ফাঁকা। মেয়েরা একধারে জটলা বেঁধে কিচমিচ করছে। মিস সাহা টেবিলে ঘাড় গুঁজে সিনেমা পত্রিকা গিলছে একমনে। বড়বাবু টেবিলের সামনে দু একজন ঘোঁট করছে।

প্রীতম উপেনকে ডাকে,—এই, মোহনবাবুর টেবিল থেকে আজকের কাগজটা দেতো।

কাগজের প্রথম পাতায় সেই খুনে পরিবারটির ছবি। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি দেওর সকলে মিলে কচি বউটাকে মেরে ফেলে বডি লুকিয়ে রেখেছিল লেপকাঁথায় মুড়ে! প্রীতম তাড়াতাড়ি কাগজের পাতা ওল্টায়। কিন্তু কোন্ পাতায় যে সে চোখ রাখে! যে দিকেই চোখ পড়ে শুধু মারদাঙ্গা, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির খবর। প্রমত্ত উল্লাসে মানুষ মানুষকে খুন করছে। যত দলবাজি পার্টিবাজি বাড়ছে, ততই হিংস্র জন্তু হয়ে যাচ্ছে মানুষ। কে যেন বলেছিল মানুষ যে কাজকে পাশবিক বলে সে কাজ করতে পশুরাও লজ্জা পায়। পশু জগতেও কিছু নিয়ম, রীতি, সময় মানামানির ব্যাপার আছে। মানুষ বোধ হয় পৃথিবীর হিংস্রতম জন্তু। বিশ্বের তাবৎ রাজনীতি, সমাজনীতি এ কোন্ দিকে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলল?

আবার রাতের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠেছে প্রীতমের। এক ভয়ানক অস্থিরতায় ছটফট করে প্রীতম। অধৈর্য চোখে ঘড়ি দেখে। চারটে বাজতে দশ। এখনও অফিস ছুটি হতে ঘণ্টা দেড়েক বাকি।

অফিসারের ঘরে ছুটি চাইতে গিয়ে প্রীতম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাইরে। খুব নীচু গলায় সাহেব কথা বলছে এক কন্ট্রাকটারের সঙ্গে। লেনদেনের হিসেব চলছে বোঝা যায়।

বাথরুমে ঢুকে মুখে মাথায় ভাল করে জল দেয় প্রীতম। তারপর কাউকে কিছু না বলেই চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ে অফিস থেকে।

বাসে এখনও তেমন ভিড় হয়নি। পিছন দিকের একটা সিট খালি রয়েছে।

প্রীতম দু চারটে মানুষকে টপকে সেখানে গিয়ে বসে পড়ে।

—কি দাদা, ঠেলা মেরে বসে পড়লেন যে?

—ওখানে আমি বসতে যাচ্ছিলাম।

—উঠুন দাদা, উঠুন। ওটা আমার সিট। আমি আপনার আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রীতম মুখ ঘোরায় না। অন্য দিকে তাকিয়েও সে টের পায় লাল গেঞ্জি, কালো চাপা প্যান্ট পরা ছোকরাটি হাতে রুমাল পেঁচাচ্ছে।

—এই শালা, শুনতে পাস্ না? ওঠ্। ওঠ্ বলছি।

প্রীতমের আচমকা মাথাটা কেমন ওলোট পালোট হয়ে যায়। উগ্র চেহারার যুবকটির আঙুলের ডগায় তীক্ষ্ণ নখ!

—সিটে কি আপনার নাম লেখা আছে?

—তোমারও কি নাম লেখা আছে নাকি শালা?

—খবরদার। তুমি তুমি করবে না।

—মুখ সামলে কথা বল্। বেশি কপচালে...

—তোর মুখও আমি থেঁতলে দিতে পারি রে শালা। ছোকরা প্রীতমের কলার চেপে ধরে সঙ্গীর উদ্দেশে বলে,—কালু, নামা তো এটাকে। একটু মেরামত করি।

প্রীতম সজোরে এক ঘুষি চালায়। আবার একবার হাতটা মুঠো করতে যেতে নিজেরই আঙুলের দিকে তাকিয়ে ফেলে। আশ্চর্য! তার আঙুলের ডগা থেকে লম্বা লম্বা হিংস্র নখ বেরিয়ে আসছে। নখগুলোকে ঝলক দেখে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রীতম। চোখ বুজে বেমক্কা নখ চালাতে থাকে।

গভীর রাতে সারা শরীরে ব্যান্ডেজ জড়ানো প্রীতমকে দেখে শিউরে ওঠে চন্দ্রা,—একি! কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হল?

প্রীতম ম্লান হাসে,—অ্যাক্সিডেন্ট নয়, মারামারি। একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি খেতে দাও, খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

চন্দ্রা কেঁদে ফেলে।

প্রীতম আলগোছে কাছে টানে বউকে,—তোমার নখগুলো কেটে ফ্যালোনি তো? আমি কালই ভাল নেলপালিশ এনে দেব।

চন্দ্রা ফ্যালফ্যাল তাকায়।

বড় পরিতৃপ্ত মেজাজে প্রীতম শুয়ে পড়ে বিছানায়।

না! আজ আর সে স্বপ্নটা দেখবে না।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স

চন্দ্রা মোটেই ভালো নেই। আজকাল সে টের পায় একটা হালকা বিষণ্ণতা যেন তাকে জড়িয়ে আছে দিনভর। হেমন্তের বিকেলের কুয়াশার মতো। অথচ চন্দ্রার তো এমনটা হওয়ার কথা নয়। যা যা আঁকড়ে ধরে একজন পঁয়তাল্লিশের রমণীর মনে সুখের বোধ সঞ্চারিত হয়, সবই তো চন্দ্রার করায়ত্ত। দায়িত্ববান স্বামী, বাধ্য ছেলে, নিজস্ব সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, ফ্রিজ-টিভি, ওয়াশিং মেশিন-মাইক্রোওয়েভ, কী নেই তার! চন্দ্রার নিজের শরীর স্বাস্থ্যও রীতিমত ভাল, জ্বরজারি সর্দিকাশির বাইরে তেমন কোনও রোগব্যাধিও তাকে ধরেনি এখনও। মধ্যবয়সী দুঃখবিলাসী গৃহে নিঃসঙ্গ গৃহবধূও তাকে বলা যাবে না, কারণ সে চাকরিও করে একটা। অফিস যে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটায়, এমন অপবাদও কি চন্দ্রা দিতে পারে? উঁহু। সেখানে তো ফাঁকিবাজিটাই কাজ। আসি যাই মাইনে পাই, এমন চাকরিতে কতটুকুই বা পরিশ্রম?

তবু চন্দ্রা ভাল নেই। কিছু ভাল লাগে না তার, কিছু না। টিভি দেখতে না, গান শুনতে না, আড্ডা মারতে না, হই-হই করতে না...। ভাল না লাগার এক জটিল আবর্তে সে যেন ঢুকে পড়েছে, বেরনোর পথ পাচ্ছে না। সকালবেলা বিছানা ছাড়তে আলস্য, যদি বা উঠলও কারুর সঙ্গে কথা বলতে বিরক্তি। প্রভাতী চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁইয়ে তৃপ্তি নেই, কাগজে চোখ বোলাতে ইচ্ছে করে না, সুবিমল কী বাজার আনল তা দেখতেও অনীহা, রান্নার জন্য মানিকের মাকে নির্দেশ ছুঁড়তেও ফুটতে চায় না স্বর। সারাটা সকাল কী হুড়দুমই না চলে বাড়িতে! একজনের স্কুল। বাপ-ছেলের হল্লাগুল্লাতেও চন্দ্রার ঘোর ঘোর ভাব কাটে কই! বরং তাকে বেরতে হবে স্মরণে এলেই বুক শ্রাবণের মেঘে ছেয়ে যায়। আবার অফিস না থাকলেও বিচিত্র এক অবসাদে কষ্‌টে মেরে থাকে মন।

কী হল চন্দ্রার?

আর কিছুকাল পরে জরায়ু যে চিরনিদ্রায় যাবে, এ কি তারই কোনও সংকেত? আগাম বারতা?

আজও সল্টলেকের বাজার প্রাঙ্গণে এসে ঘন ঘন হাই উঠছিল চন্দ্রার। কোন এক মন্ত্রী মারা গেছে কাল, অফিস তাই হাফ ছুটি হয়ে গেল, দল বেঁধে সিনেমা দেখতে গেল অনেকে, তাদের কাটিয়ে চন্দ্রা চলে এসেছিল এখানে। নতুন এই শপিং মলটার কাছেই তার বাড়ি। হাঁটা পথে মিনিট দশেক। ভেবেছিল এখানে খানিক সময় কাটিয়ে ফিরবে সন্ধের মুখে মুখে। বদ্ধ হলে বসে পরদার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার যন্ত্রণাও পোহাতে হল না, ফাঁকা ফ্ল্যাটের নির্জনতায় ফিরে একা একা কড়িকাঠও গুনতে হল না—আলো ঝলমল পরিবেশ হেঁটে চলে বেড়ানো তাও মন্দের ভাল।

কিন্তু এখানেও ঠিক চন্দ্রার পোষাচ্ছে কই? নাহ্ এই বিচ্ছিরি শুকোরোগটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। নিজেকে শায়েস্তা করতেই বুঝি ঘুরে ঘুরে খান কতক জিনিস কিনে ফেলল চন্দ্রা। দুটো সুদৃশ্য রঙিন মোমবাতি, মাইক্রোওয়েভের টুকরো টাকরা কিছু বাসনকোসন, এক বাক্স পেপার ন্যাপকিন। মৃদু একটা সৌরভ আছে ন্যাপকিনে, গন্ধটা শুঁকতে শুঁকতে অলস পায়ে চন্দ্রা এসে দাঁড়িয়েছে এক ঘড়ির দোকানের সামনে। অন্দরে দেওয়াল জোড়া আয়না। ঝুলছে অজস্র বাহারি ওয়ালক্লক। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা সময়। কান পাতলে কাঁটার আওয়াজও যেন শোনা যায়। টিক টিক টিক টিক।

ঠিক তখনই মস্তিষ্কে জোর ঝাঁকুনি। ঘড়ির দোকানের আয়নায় ও কার প্রতিবিম্ব? অভ্র না? উল্টোদিকের আইসক্রিম পারলারে দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে?

প্রাথমিক অভিঘাতটুকু সামলে চন্দ্রার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর। অভ্র এখানে এল কোত্থেকে? চন্দ্রা যত দূর জানত, অভ্র তো হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা। বহুকাল। যদি বা কাজেকর্মে কলকাতায় এসেও থাকে, বাড়ি তো সেই গড়িয়ায়! লবণহ্রদের এই বাজারে সে একা একা কী করতে এসেছে? নিশ্চয়ই শুধু আইসক্রিম খেতে নয়? কিছু কিনতে টিনতে আগমন? দূর অতীত, প্রায় আগের জন্মের কথা, তবু চন্দ্রার মনে পড়ল। মার্কেটিং অভ্রর দু'চক্ষের বিষ ছিল। পারতও না। গেঞ্জি জাঙ্গিয়া পর্যন্ত কখনও স্বহস্তে কেনেনি; দায়িত্বটা ছিল অভ্রর মার ঘাড়ে। এবং বিয়ের পর চন্দ্রার। সেই কত যুগ আগে শেষ দেখা, চন্দ্রা ভুল করছে না তো?

চন্দ্রা ঘাড় হেলাল। অতি সন্তর্পণে। যেন কোনও ভাবেই না অভ্রর সঙ্গে

চোখাচোখি হয়ে যায়। তেরচা দৃষ্টি হেনে সিগনাল পেল মগজের, অভ্রই বটে। ছিপছিপে চেহারা ভারী হয়েছে সামান্য, মুখে ঈষৎ ফোলা ফোলা ভাব, তবে মাথাভরা চুল এখনও একই রকম ঘন, মোটা লেন্সের ভেতর দিয়েও চোখ অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল। হাবভাবেও বদল হয়নি এতটুকু। সেই আগের মতোই উদোমাদা ভঙ্গি, সেই লম্বা শরীরখানা ঝুঁকিয়ে বাচ্চাদের মতো চেটে চেটে আইসক্রিম খাওয়া, সেই বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে দোকানের মধ্যিখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকা...। কে বলবে এই লোকটাও পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে?

কানের পরদায় ঘড়ির কাঁটার অস্পষ্ট ধ্বনি। চোখের তলায় ঝাপসা ঝাপসা ছবি।

জামাইষষ্ঠীতে চন্দ্রার বাপের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে অভ্র। পাঁঠার নলি পড়েছে পাতে। দিদি জামাইবাবু বাবা চন্দ্রা সবার খাওয়া শেষ, ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছে, অভ্র বেহুঁশের মতো নলি ঠুকে চলেছে প্লেটে আর মাঝে মাঝে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে টানছে। নতুন জামাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে মা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না, বাবারও তথৈবচ দশা। জামাইবাবু চোখের ইশারায় চন্দ্রাকে জিজ্ঞেস করল, অভ্রর মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে কিনা। দিদি ভ্রূকুটি হানল জামাইবাবুকে।

সামাল দেওয়ার জন্য চন্দ্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—তোমাকে কি আর একটা হাড় দেবে? ওতে বোধহয় আর কিছু নেই।

—আছে আছে। অভ্র নির্বিকার,—দ্যাখো, শাঁস এখনও পুরো বেরোয়নি।... তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, হাত ধুয়ে নাও।

সেদিন বাড়ি ফিরে চন্দ্রা খুব বকাবকি করেছিল, অভ্র আমলই দেয়নি। যেন ভেবেই পায়নি ওই তুচ্ছ একটা ব্যাপারে অন্যের মাথাব্যথা কেন। কী যে সব বাজে বাজে অভ্যেস ছিল অভ্রর! প্রবল শব্দ তুলে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া, চকাম্ চকাম্ আওয়াজ করে খাবার চিবানো...। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে খোশ গল্পের মাঝে এঁড়ে তর্ক জুড়ে দিত যখন তখন। মতে না মিললেই যাকে তাকে যা নয়, তাই বলে দিত। একবার তো চন্দ্রার বাবাকেই শুনিয়ে দিল, আমায় আলফাল বোঝাতে আসবেন না, আমি সব বুঝি! কী শিক্ষা দিয়েছিল অভ্রর মা! ছোটবেলায় বাপ মরেছে বলে আহ্লাদ দিয়ে কচি খোকাটি বানিয়ে রেখেছিল ছেলেকে। আর চন্দ্রারও কপাল, ওই ছেলেমানুষি দেখেই কিনা মায়া জাগল মনে, দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেল, বিয়েও পর্যন্ত করে ফেলল আগুপিছু না ভেবে। এই সময় কত বারণ করেছে বন্ধুরা। অনর্গল কানের কাছে বিনবিন

করত, লালটু চেহারা দেখে ভুলিস না চন্দ্রা, ছেলেটা কিন্তু এক নম্বরের ক্যালাস...! কিন্তু চন্দ্রার যে তখন রোখ চেপে গেছে। দ্যাখ না তোরা, ওকে আমি মানুষ করে ছাড়বই!

হায় রে, অভ্রকে সযুত করবে চন্দ্রা! একটা কু-অভ্যাসও বদলাতে পেরেছিল অভ্রর?

পারলে কি বিয়ের দু'বছর কাটতে না কাটতেই সুতোটা ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যায়?

আইসক্রিম শেষ। সেই পুরনো প্র্যাকটিস, টিপ করে বিনে কাপ ছুঁড়ল অভ্র। এবং বাইরে ফেলল। চন্দ্রা ঝটিতি মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাঁটা শুরু করেছে।

পাঁচ পা'ও বুঝি যায়নি, ঘাড়ের কাছে গমগমে গলা,—কী ব্যাপার, দেখে কেটে পড়ছ যে?

অগত্যা চন্দ্রাকে থামতেই হয়। সরাসরি অভ্রর মুখপানে তাকাল চন্দ্রা। অভ্র মিটিমিটি হাসছে। চন্দ্রাও জোর করে চিলতে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। অপ্রস্তুত স্বরে বলল,—না মানে...ভাবলাম তুমি হয়তো...

—অ্যাভয়েড করছ কেন? এখনও রাগ পড়েনি?

—যাহ্ কী যে বলো! অ্যাদ্দিন কেউ রাগ পুষে রাখে নাকি?

—আমিও তো তাই ভাবছিলাম। আমাদের সম্পর্ক তো কবেই চুকে বুকে গেছে, এখন তো আমি আর তোমার শত্রু নই, ঠিক কি না?

অভ্রকে কি কখনও চন্দ্রা শত্রু ভেবেছিল? রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির সময়ে হয়তো কথাটা বলেও থাকতে পারে, এখন আর স্মরণে নেই। তবে অভ্রর তো সে কখনও খারাপ চায়নি। চন্দ্রা মৃদু স্বরে বলল,—হুম।...তা আছ কেমন?

—কেমন দেখছ?

—মনে হচ্ছে তো ভালই।

—তাহলে তাই।

—হায়দ্রাবাদে চলে গিয়েছিলে শুনেছিলাম। আশা করি এখনও সেখানেই...?

—না তো। হায়দ্রাবাদ কবেই ছেড়ে দিয়েছি। ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিলাম। তারপর চেন্নাই। দেন টু পুনে। সেখান থেকে নাগপুর। অভ্র একগাল হাসল,—এখন গোয়ায়। অ্যাট পানাজি।

এবার অদৃশ্য এক ঘড়ির কাঁটায় আওয়াজ। টিক টিক টিক টিক।

হোটেল ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিধারী অভ্র বিয়ের প্রথম বছরেই তার তিন

নম্বর চাকরিটি ছেড়ে বাড়ি এসে বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছে। তখনও চাকরি না পাওয়া চন্দ্রা স্তম্ভিত মুখে বলল,—তুমি এখানেও টিকতে পারলে না?

—ধুৎ, পোষাল না। ছাত্রিশটা রুম, তো তার একশো ছেষট্টি রকমের ফরমায়েশ। এ এসে চোখ রাঙায়, ও এসে মেজাজ দেখায়...। প্লাস, শালা মালিকটা বহুৎ খাটাচ্ছে।

—তোমার তো প্রতিবারই এক কমপ্লেন।

—প্রবলেম সেম হলে কমপ্লেনও সেম হবে।

—তুমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়েছিলে কেন? জানতে না, কাস্টমার ডিল করতে হবে? কেন একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছ না?

—জ্ঞান মেরো না তো। তোমার অসুবিধেটা কী হচ্ছে শুনি? মা'র তো এখনও রিটায়ারমেন্টের ছ'বছর বাকি আছে।

—লজ্জা করে না বলতে? বিয়ে থা করে মার ঘাড়ে বসে খাবে?

—ঘ্যান ঘ্যান কোরো না তো। মার পয়সায় খেতে তোমার মানে বাধলে তুমি কোনও কাজে লেগে যাও।...আর হ্যাঁ, ভাল করে এক কাপ চা বানাও তো দেখি। লিকার বেশি, দুধ বেশি, চিনি বেশি।

—তুমি কী গো? তোমার কোনও ভাবনা নেই?

—ফালতু টেনশান করব কেন? দু চার মাসের মধ্যে আবার একটা কাজ ঠিক পেয়ে যাব।

সেই প্র্যাকটিস আজও বজায় রেখেছে অভ্র! চন্দ্রা অপাঙ্গে অভ্রকে দেখতে দেখতে বলল,

—তুমি তাহলে বদলাওনি?

—এবার ভাবছি বদলাব। গোয়াতেই সেট্‌ল করে যাব।

—তাই বুঝি?

—ইয়েস। অভ্র ঘড়ি দেখল। ঈষৎ চঞ্চলও হয়ে উঠল যেন। জিজ্ঞেস করল,—তোমার কি তাড়া আছে?

—কেন?

—চলো না একটু কফি শপে গিয়ে বসি।

চন্দ্রা একটুক্ষণ ইতস্তত করল। অভ্র কি তার সঙ্গ কামনা করছে? শেষের দিকে তাদের সম্পর্কটা এত তিক্ত হয়ে গিয়েছিল যে একপলও অভ্রকে সহ্য করতে পারত না চন্দ্রা। অথচ কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে তো অভ্রর প্রস্তাবে কোনও বিরক্তি জাগে না মনে? একটু বা হয়তো আড়ষ্ট লাগছে, তার বেশি কিছু নয়।

কালের পলির নীচে বিরাগ কি তবে চাপা পড়ে গেছে পুরোপুরি? নাকি মনের কোনও গহিনে অভ্র রয়ে গেছে এখনও? নাকি এ শুধুই চোরা কৌতূহল যা শুধু মেয়েদেরই থাকে? এক সময়ের প্রিয় পুরুষ এখন কেমন আছে তা জানার গোপন ঔৎসুক্য কি এ?

হ্যাঁ না বলতে হল না, ঘাড়ও নাড়ল না চন্দ্রা, হাঁটছে ধীর পায়ে। অভ্রর পাশে পাশে। দু'ধারের বিপণিতে থরে থরে মনোহারি সামগ্রী, একদিকে তাকাচ্ছিল চন্দ্রা, তবে যেভাবে কিছুই দেখছিল না। টুকরো টুকরো কথা মনে পড়ছিল। সুখের। দুঃখের। তিক্ততার। আনন্দের। বিশ বছর ধরে কোন ঝাঁপিতে যে রয়ে গেছিল স্মৃতিগুলো? সামান্য নাড়াচাড়া করে চন্দ্রা সরিয়ে রাখছিল তাদের। ফুসফুসে খানিকটা বাতাস ভরে নিয়ে চন্দ্রা জিজ্ঞেস করল,—কোথায় উঠেছ? তোমাদের গড়িয়ার বাড়িতে?

—ও বাড়ি তো বিক্রি হয়ে গেছে। মা'র রিটায়ারমেন্টের পর পরই।

—ও। তোমার মা তাহলে তোমার সঙ্গে...?

—ছিল। এখন নেই। অভ্র ম্লান হাসল,—মা আর দুনিয়াতেই নেই।

—কবে...?

—এই তো, বছর দুয়েক আগে। হঠাৎ পানাজিতেই।

—সরি। খবরটা আমি জানতাম না।

—জানার তো কথাও নয়। তারপর তো আর আসিও নি কলকাতায়, এখানকার কারুর সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগও নেই...। এবার মাসি হঠাৎ ডাকল...মাস খানেকের ছুটিও পেয়ে গেলাম...

কথায় কথায় এসে গেছে কফি শপ। খোলা আকাশের নীচে ছড়ানো ছেটানো বেশ কিছু টেবিল চেয়ার। প্রথম ফাল্গুনের বিকেল, রোদের তেমন তাপ নেই, তাও একটা ছায়া ছায়া কোণ দেখে বসল চন্দ্রা। অভ্রর মুখোমুখি। অভ্র জিজ্ঞেস করল,—কী খাবে বলো?

—কফি।

—সে তো বলছিই। সঙ্গে স্যান্ডুইচ? বারগার?

—শুধু কফি।

বেয়ারাকে দুটো কফির অর্ডার দিয়ে অভ্র গুছিয়ে বসেছে। চন্দ্রা ভুরু কুঁচকে বলল,—তুমি না এক্ষুনি আইসক্রিম খেলে? আবার কফি খাবে?

—সো হোয়াট? তখন আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছিল, এখন মনে হচ্ছে কফিও একটু চলতে পারে।

—পারও বটে। সেই হুইমজিকাল নেচার আর গেল না।

—সবাই কি আর মেথডিকাল হতে পারে? তোমার মত? অভ্রর চোখে আলগা ঠাট্টা, ডিভোর্সের পর কেমন সুন্দর পরীক্ষায় বসলে, চাকরি পেলে, বিয়ে থা করলে...

চন্দ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—বিয়েটা খুব ক্যালকুলেশন করে করিনি অভ্র। বাবা মা খুব দুশ্চিন্তা করত আমায় নিয়ে...দিদি জামাইবাবু খুব জোর করল...

—আহা, ঠিক আছে। আমি কি কৈফিয়ত চাইছি নাকি? অভ্র হা হা হেসে উঠল। কবজি ঘুরিয়ে আর একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল,—যাক গে, দিস টাইম ইউ আর হ্যাপি আই প্রিজিউম?

চন্দ্রা উত্তর দিল না। ঠোঁট টিপল সামান্য।

—তোমার হাজব্যান্ড যেন কী করেন?

—চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রাইভেট ফার্মে আছে।

—ওরে বাবা, সি এ! তা হলে নিশ্চয়ই খুব হিসেবি মানুষ? অভ্রর গলায় ফের ব্যঙ্গ।

চন্দ্রা গোমড়া হল,—ডিপেন্ড করা যায় এমন মানুষ তো বটে। ভেরি কেয়ারিং পারসন। আমার মাথা ধরলেও সে উতলা হয়ে পড়ে।

অভ্র একটু থমকে রইল। অতীতের কথা কিছু মনে পড়ল কি? পরক্ষণেই মুখে অমলিন হাসি,—তুমি ঠিক ডিসিশানই নিয়েছিলে চন্দ্রা। আমার সঙ্গে থাকলে তোমায় শুধু জ্বলতেই হত।

চন্দ্রা যেন শুনেও শুনল না কথাটা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে এদিক-ওদিক। খানিক তফাতে একটাই কোল্ড ড্রিংকসের বোতলে দুখানা স্ট্র ঢুকিয়ে হুশ হুশ টানছে এক জোড়া তরুণ তরুণী, মাঝে মাঝেই পান থামিয়ে দুজনে ভেঙে পড়ছে উচ্ছল হাসিতে। অনেক দিন আগের একটা দৃশ্য চন্দ্রার বুকে উঁকি দিয়ে বুকেই মিলিয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্য উন্মন হল চন্দ্রা।

সুবিমলের সঙ্গে এরকম কোনও ছবি আছে কি তার? এতটা তরল হওয়ার কথা সুবিমল বুঝি ভাবতেই পারে না। সে স্বামী। প্রথম থেকেই পুরোপুরি স্বামী। প্রেমিক কদাপি নয়। কফি এসেছে টেবিলে। অভ্র গলা খাঁকারি দিল,—নাও।

—হুম।

—কী এত ভাবছ?

—কিছু না। কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল চন্দ্রা,— তোমার খবর বলো। কী করলে

অ্যাদ্দিন?

—চাকরি। ঘুরে ঘুরে। চরে চরে।

জিজ্ঞেস করবে না করবে না করেও চন্দ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—তাবিয়ে করলে না কেন?

অভ্র চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখল চন্দ্রাকে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে কাপে, আগের মতোই শব্দ করে।

শব্দটা আজ যেন সেভাবে কানে বাজল না চন্দ্রার। ফের বলল,—আমার মতোই আর একটা ট্রাই নিতে পারতে। নেক্সট জন আমার মতো দজ্জাল নাও হতে পারত।

চন্দ্রার গলায় হাল্‌কা কৌতুকের সুর। তবে অভ্র বুঝি সেভাবে খেয়াল করল না। ঈষৎ আনমনা ভাবে তাকাচ্ছে চন্দ্রার দিকে, নামিয়ে নিচ্ছে মাথা। অভ্র যেন লজ্জা পাচ্ছে, মনে হচ্ছিল চন্দ্রার। শুধু চন্দ্রার কথা ভেবে ভেবেই কুড়িটা বছর কাটিয়ে দিল, এই সরল সত্যটুকু উচ্চারণ করতে নির্ঘাৎ দ্বিধা বোধ করছে অভ্র।

ডিভোর্সে যে অভ্রর সায় ছিল না, সে তো চন্দ্রা ভাল মতোই জানে। অপদার্থ খামখেয়ালি অভ্র সেনগুপ্তকে জীবন থেকে নির্বাসিত করার জন্য চন্দ্রাই কি বেশি ব্যাকুল ছিল না? মিউচুয়াল সেপারেশনের প্রস্তাবটা অবশ্য অভ্ররই, কোর্ট কাছারির যুদ্ধে সে যেতে চায়নি। লড়াই হলে চন্দ্রার পক্ষে মুক্তি পাওয়া অত সহজ হত কি? চরিত্রহীন দূরস্থান, অভ্রর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগটাও কি সে প্রমাণ করতে পারত?

সহসা আজ, এই মুহূর্তে, নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল চন্দ্রার। কুড়ি বছর পর। মাঝের এই লম্বা সময়টায় অভ্রর কথা যে তার কখনও মনে পড়েনি, এমনটা নয়। কিন্তু এই দংশন বোধহয় কখনও ছিল না। বরং এর মধ্যে সে একটু একটু করে একটা নিটোল সংসার গড়ে নিয়েছে। স্বামী ছেলে নিয়ে এখন তো দিব্যি এক নিশ্চিন্ততার দুর্গে তার বাস। কিন্তু অভ্র কী পেল জীবনে? চন্দ্রাকে ভালবেসে? ভাবনাটায় বুঝি চাপা তৃপ্তিও আছে, যা কি না সময়কে অনেকটা পেরিয়ে এলে তবেই অনুভব করা যায়। কুয়াশামাখা হেমন্তের বিকেলটা যেন সরে যাচ্ছিল চন্দ্রার। পড়ন্ত সূর্যের মায়াবি আলোয়, ফাল্গুনের নরম বাতাসে, তার সামনে অভ্রর এই নতমুখে নিশ্চুপ বসে থাকা হঠাৎই কেমন অলীক মনে হচ্ছে। এ যেন সত্যি নয়, আবার সত্যিও। সুখ নয়, আবার যেন সুখও।

অনুচ্চ স্বরে চন্দ্রা ডাকল,—অভ্র?

উঁ?

—একটা কথা বলব?

—কী?

—এখনও সময় যায়নি। একটা বিয়ে করে ফ্যালো।

—বলছ?

—হুঁ। শেষ বয়সে তো একটা সঙ্গীরও দরকার হবে।

—মা'ও ঠিক এ কথা বলত। আমি পাত্তা দিইনি। অভ্র নড়েচড়ে বসল,—ভাবতাম, মা আর আমি আছি, ভালই তো কেটে যাচ্ছে। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, শখ করে আবার কে ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যেতে চায় বলো? কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর থেকে সত্যিই খুব লোন্‌লি ফিল করছি। বাড়ি ফিরে ভূতের মতো বসে থাকা...হয় টিভি, নয় বোতল...ভাল লাগে না। তাই মাসি যখন বলল, আমার জন্য একটা মেয়ে দেখে রেখেছে...আমি আর না করতে পারলাম না। ইনফ্যাক্ট, বিয়েটা করার জন্যই এবার আমার কোলকাতায় আসা।

থতমত চন্দ্রার মুখ পলকে পাংশু। জোর করেও হাসি ফোটাতে পারছে না। কোনও ক্রমে বলল,—তাই বুঝি? ....তা সে কী করে?

—একটা প্রাইভেট স্কুলে পড়াচ্ছে। এখানেই। সল্টলেকে। বি-এড করা আছে, গোয়ায় গিয়েও চাকরি পেতে অসুবিধে হবে না। অভ্র আবার ঘড়ি দেখল। একটু চিন্তিত মুখে বলল,—এতক্ষণে তো চলে আসার কথা। এই কফি শপে আমায় ওয়েট করতে বলেছিল।

কোথ্‌থেকে আচমকা একরাশ ক্রোধ এসে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল চন্দ্রার পাঁজরে। রাগটা কোনও মতে গোপন করল বটে, কিন্তু গলায় বাঁকা সুর এসেই গেল,—তোমাদের এখন কোর্টশিপ চলছে বুঝি?

—তুৎ, এই বুড়ো বয়সে ওসব হয় নাকি!... জাস্ট পরস্পরকে একটু চিনে রাখা, এলোমেলো আড্ডা...। শ্রীপর্ণার তেমন একটা বন্ধুবান্ধব নেই, দুজনে মিলে তাই একটু সময় কাটানো...। নেক্সট উইকেই রেজিস্ট্রিটা করে ফেলছি।

—ও। এবার চন্দ্রা ঘড়ি দেখল,—তোমাদের তা হলে আর ডিস্টার্ব করব না। উঠি।

—এইই, যাবে কোথায়, বোসো। শ্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

চন্দ্রার ভেতরটা চিড়বিড় করছিল। কিন্তু হুট্ করে চলে যাওয়াও তো বিসদৃশ দেখায়। অভ্র যদি বুঝে যায়, চন্দ্রা হিংসেয় জ্বলছে, নিশ্চয়ই হাসবে মনে

মনে। হয়তো হবু বউকে চন্দ্রার চকিত পলায়নের গল্প শুনিয়ে দারুণ মজা পাবে।

চন্দ্রা নিজেকে স্থিত করল। তবু ফাগুন হাওয়া তাকে কেন বেপথু করে দেয় বার বার? এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও? আশ্চর্য, যাকে সে একদিন স্বেচ্ছায় বাতিল করেছিল, দীর্ঘকাল যার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই, কালেভদ্রে যার কথা মনে পড়ত কিনা সন্দেহ, হঠাৎ সে আজ চন্দ্রাকে তোলপাড় করে দেয় কোন ম্যাজিকে? এক্ষুনি একটা ভূমিকম্প টুমিকম্প হলে ভাল হত না কি?

এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা দিনের চেয়েও দীর্ঘতর। প্রতিটি মিনিট যেন বছরের চেয়েও লম্বা। সূর্যের গতি সহসা থেমে আছে। সময় কি এগোতে ভুলে গেল?

ঘড়ির কাঁটার হিসেবে অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না চন্দ্রাকে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে গেছে অভ্রর শ্রীপর্ণা। কালো শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, বয়স পঁয়তাল্লিশ না হলেও চল্লিশ তো হবেই। ইশ্ এর নাম শ্রীপর্ণা? অভ্রর রুচিরও বলিহারি, এরকম একটা বউ পছন্দ হল? চন্দ্রার পরে? আবার ছোট করে বলে শ্রী! আদিখ্যেতা!

স্মিত মুখেই শ্রীপর্ণার সঙ্গে সঙ্গে আলাপপরিচয়টা সারল বটে চন্দ্রা, তবে রইল না বেশিক্ষণ। দুটো চারটে মামুলি কথা বলে বেরিয়ে এল দোকান ছেড়ে। রাস্তায় এসে টের পেল শরীরটা কেমন কাঁপছে। মাথায় জ্বালা জ্বালা ভাব। অভ্র আজ এই ভাবে তাকে প্রতারণা করল? প্রতারণাই তো। একটা বিশ্বাসকে আস্তে আস্তে মনে গেঁথে দিয়ে হঠাৎ তা সমূলে উপড়ে ফেলাকে আর কী বলা যায়? কী অপমান, কী অপমান! চন্দ্রা কি না ধরেই নিয়েছিল অভ্র এখনও তার বিরহে বিবাগী হয়ে আছে? কেমন ঝামা ঘষে দিল মুখে? কুড়ি বছর পর?

একটা গনগনে আঁচ নিয়ে চন্দ্রা বাড়ি ফিরল। অভ্রর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎটা যে নিছকই আকস্মিক, এর মধ্যে কারুরই কোনও হাত ছিল না, এই সোজা ব্যাপারটুকুও আর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে চিন্তা করতে পারছে না সে। মিছিমিছি টুবলুকে দাবড়াল খানিক, রাতের রুটি যথেষ্ট নরম হয়নি বলে বকুনি খেল মানিকের মা...। টিভি খুলে বসেছে। চ্যানেল ঘোরাচ্ছে বার বার, ভলিউম কখনও বাড়াচ্ছে তো কখনও কমাচ্ছে...। ঘুরেফিরে চোখের পাতায় অভ্র আর শ্রীপর্ণা। ছি, ওই বউ নিয়ে গোয়ায় বিচে বেড়াবে অভ্র? কুৎসিত। হাস্যকর।

সুবিমল যথারীতি দেরি করে ফিরল অফিস থেকে। নৈশাহার সেরে ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল নিয়ম মতো। শোওয়ার ঘরে যাওয়ার আগে টুবলুকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল চন্দ্রা। এবার নাইন হবে টুবলুর, অ্যানুয়াল পরীক্ষা

প্রায় এসে গেল, ছেলে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ছে এখনও। ভারি শান্ত ছেলে। বাবার কার্বন কপি। ঠিক এগারোটা বাজলেই লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়বে ছেলে, চন্দ্রা জানে। ঘরে এসে চন্দ্রা ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়াল। মুখে নাইটক্রিম ঘসতে ঘসতে শ্যেনদৃষ্টিতে নিজেকে নিরীক্ষণ করছে। মুখমণ্ডলে শুকনো শুকনো ছাপ একটা আছে হয়তো, তবে তার ত্বক এখনও যথেষ্ট মসৃণ, কপালে বলিরেখার আভাস মাত্র নেই। এমন কিছু মুটোয়ওনি সে। হাসলে এখনও ছোট্ট টোল পড়ে গালে।

হানিমুনে ওই খাঁজটুকুতেই না ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি ফেলে পান করেছিল অভ্র!

আচমকা পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল চন্দ্রার। এবার অভ্র কী করবে? ওই আধবুড়িটার তোবড়ানো গালে কি..!

সুবিমল ল্যাপটপের সামনে বসে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই চোখ পড়েছে চন্দ্রায়। অবাক হয়ে বলল,—একা একা হাসছ কেন? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

চন্দ্রার হাসি আরও বেড়ে গেল। চপল স্বরে বলল,—এই জানো আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

—কী রকম?

—সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। সেখানে বহুকাল পর হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা। কে বলো তো?

—আমি কী করে বলব?

—গেস করো।

—আমার গেস টেস আসে না।

—আহা, একটু গেস করোই না।

—তোমার অফিসের কেউ?

—উঁহু।

—তা হলে বুঝি তোমার সেই পিসি? যিনি তিন নম্বর সেক্টরে বাড়ি করেছেন।

—তুৎ, ওরকম কেউ নয়। অভ্র।

—কে অভ্র?

—আহা, জানো না যেন! অভ্র...অভ্র...

—ও, তোমার সেই অভ্রকুমার?

—হ্যাঁ গো। অনেক গল্পটল্প করল, কফি খাওয়াল...। চন্দ্রার পেটে আবার

সোডার বোতলের বুড়বুড়ি,—বুড়ো বয়সে তার ফের ছাদনাতলায় যাওয়ার সাধ জেগেছে। বিয়ে করতে এসেছে কলকাতায়। পাত্রীটিও দেখলাম। ম্যাগো, রূপের ধুচুনি।

—সে যার যাকে ভাল লাগে। সুবিমল লম্বা হাই তুলল। ল্যাপটপ অফ করতে করতে বলল,—যাক গে, কাজের কথা শোনো। শ্রীধর কিন্তু মার্চেই ফ্ল্যাটটা রং করছে। টুবলুর পরীক্ষা হয়ে গেলেই কাজ শুরু। দিন সাতেকের মতো সময় লাগবে। তখন হয়তো তোমায় ছুটি নিতে হতে পারে, অফিসে বলে রেখো।..শ্রীধর এস্টিমেট যা দিল, হাজার পঁচিশ পড়ে যাবে। তাও খুব একটা বেশি নয়, কী বলো?

চন্দ্রার উচ্ছ্বাস ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেছে যেন। কতকাল পর অভ্রর ক্ষণিক সান্নিধ্য অজস্র রঙিন অনুভূতির খেলা চলছিল অন্তরে। কখনও বা মেদুর স্মৃতি, কখনও বা জয়ের পুলক, কখনও আবার অকারণ ঈর্ষার চোরা কামড়। সবই যেন ভোঁতা সহসা। বিবর্ণ। যেন নিস্তরঙ্গ পানাপুকুরে ঢেউ উঠেছিল একটা; ঘূর্ণি থেমে ফের সবুজ পানায় ঢেকে যাচ্ছে জলতল।

কোনও উত্তর দিল না চন্দ্রা। ভারী পায়ে বিছানায় এল।

ল্যাপটপের ডালা বন্ধ করে টেবিলে রাখল সুবিমল। ফ্যানের রেগুলেটার কমাল এক পয়েন্ট, দেখে নিল মশাবিতাড়ন যন্ত্রটি জ্বলছে কি না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল,—এবার ভাবছি রংগুলো একটু বদলাব। অফ হোয়াইট ঘেঁষা হলে ঘরের লাইট অনেক বাড়ে।

চন্দ্রা বালিশে মাথা রাখল। চোখ বুজেছে। সুবিমল ফের বলল,—শেডকার্ডটা দেখেছ? ড্রেসিংটেবিলেই তো রাখা আছে।

চন্দ্রা অলস গলায় বলল,—দেখব'খন।

—যে রং পছন্দ, টিক মেরে দিয়ো কিন্তু। আমার মনে হয় অ্যাপল হোয়াইটটা আমাদের বেশ স্যুট করবে।

চন্দ্রা নিশ্চুপ। পাশ ফিরল। আবার সেই কিচ্ছু ভাল-না-লাগা কুয়াশার ছোঁয়া। আবার সেই হেমন্তের বিকেল।

হিসেব মেলে না

আজ আবার দোতলায় জোর ধুন্ধুমার। মাঝে কিছুকাল বন্ধ ছিল, ফের শুরু হয়েছে সম্প্রতি। মদে চুর হয়ে এসে যথারীতি নাচনকোদন জুড়েছে সাহেব। পিয়ালিও ছোড়নেওয়ালি নয়, পাল্লা দিচ্ছে সমানে। সাহেবের জড়ানো গলায় গালাগালির ফোয়ারা, তো পিয়ালির তীক্ষ্ণ স্বরে পালটা শাসানি! কাচের কী যেন আছড়ে পড়ল মেঝেয়, ঝনঝন করে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। পরক্ষণে আরও জোরে আওয়াজ। ভারী কিছু উল্টোল বোধ হয়। সোফা টেবিল গোছের।

আমার টিভি দেখা মাথায়। নৈশাহার সেরে, রান্নাঘর-টান্নাঘর গুছিয়ে সবে পছন্দমতো চানেল খুলে বসেছি, একঘেয়ে সিরিয়ালটা আজ যেন সামান্য জমছিল, কিন্তু ওপরতলার তাণ্ডবে শ্রবণসুখের দফারফা। ভলিউমও বাড়ানো যাবে না, বুবলি পড়ছে ও ঘরে।

পাশেই তাপস। সোফায় হেলান, ঠোঁটে সিগারেট, হাতে টিভির রিমোট। বিজ্ঞাপনের বিরতির জন্য ওত পেতে থাকে তাপস, প্রথম সুযোগেই চ্যানেল পালটে ঢুকে পড়ে ফুটবল, ক্রিকেটে। ওপরের দাপাদাপিতে তাপসের ভুরুতেও ভাঁজ।

চাপা গলায় বললাম,—বুবলির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো। মেয়েটার সামনে পরীক্ষা...

—ঘরে খিল আঁটলেও কি রেহাই পাওয়া যাবে? বাড়িটাই বদলানো দরকার।

—তো উঠেপড়ে একটু লাগো না। জমিটা কিনে ফেলে রেখেছ কেন?

—যাহ্ বাবা! কর্পোরেশনে প্ল্যান জমা দিয়ে এলাম...! স্যাংশনটা হোক, সঙ্গে সঙ্গে কাজ স্টার্ট করে দেব।

—তদ্দিনে এ বাড়িতে এক্সট্রিম কিছু না ঘটে যায়।

—মনে হয় না। দ্যাবা দেবী সে দিক দিয়ে যথেষ্ট সেয়ানা। দুজনেই গানবাজনার লোক, খানিকক্ষণ ভজনকেত্তন করে আপনিই থেমে যাবে। আমি ওরিড বুবলিকে নিয়ে। এমন একটা বাজে পরিবেশে বেচারা...

সত্যি, বাড়িটা যেন নরক হয়ে উঠেছে। সাহেব যেমন মদ গিললে পশু, পিয়ালিও ঠিক তেমনই জাঁহাবাজ। ছেলেটা যখন মাতাল হয়ে ফেরে, গায়ে পড়ে তাকে খোঁচাখুঁচি না করলেই হয়। রা না কাড়লে সাহেব কতক্ষণ চেল্লাবে একা একা? তা পিয়ালির সেই জ্ঞানগম্যি থাকলে তো। মুখে মুখে চোপা চালাবেই, ঠেস দেওয়া দেওয়া কথা ছুঁড়বেই, সাহেব খেপবে আরও, এটা ছুঁড়বে, ওটা ভাঙবে...। আমরা তো নেহাতই ভাড়াটে, আমাদের কথা নয় বাদই দিলাম, নিজেদের ঘরেই যে একটা শিশু আছে, বুড়ি শাশুড়ি আছে, সে বোধটুকুও থাকে না পিয়ালির।

বিরক্ত মুখে বললাম—কেন যে মরতে ওরা বিয়ে করেছিল!

—পেরেম হয়েছিল যে।

—ঝাড়ু মারি অমন প্রেমের মুখে।

—এখন তো ও কথা বললে চলবে না। তাপস হাত বাড়িতে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। বাঁকা হেসে বলল,—তুমিই না একদিন বলেছিলে প্রেমের অনেক প্লাস পয়েন্ট আছে। পিয়ালির ভালবাসাই নাকি সাহেবকে বদলে দেবে?

—বলেছিলাম। তখন সে রকমই মনে হয়েছিল।

—মনে হওয়াটা কত ফাঁপা ছিল, সেটা এখন টের পাচ্ছ তো? তাপস দু-এক সেকেণ্ড চুপ। কান পেতে শুনছে ওপরের কাজিয়া। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—শোনো, কাছের মানুষের বদ স্বভাব বদলাতে গেলে নিজেকেও অনেক সংযত হতে হয়। তুমি তোমার খেয়ালখুশি মতো ফূর্তি মেরে বেড়াবে, আর তোমার নেশাখোর বর মালটাল খাওয়া ছেড়ে পূতচরিত্র ভগবান বনে যাবে, এতটা আশা করা সিম্পলি বাড়াবাড়ি। অ্যাম আই রং?

কী জবাব দেব? তাপস তো ভুল কিছু বলেনি। সাহেবের হাজার দোষ থাকতে পারে, পিয়ালিও মোটেই সুবিধের নয়। এখন তো মাঝে মাঝে পিয়ালিকেই আমার খলনায়িকা মনে হয়।

অথচ প্রথম প্রথম পিয়ালিকে একদম অন্যরকম লেগেছিল। কী সুন্দর কথা বলে, কী মিষ্টি ব্যবহার, দেখতেও যেন ঢলঢলে লক্ষ্মীপ্রতিমাটি! সাহেবের বউ

হওয়ার আগেও পিয়ালিকে দেখেছি কয়েক বার। টিভির পরদায়। খবরের কাগজে। ম্যাগাজিনের পাতায়। গায়িকা হিসেবে তখনই সে বেশ সম্ভাবনাময়। ক্যাসেট বেরিয়ে গেছে খান তিনেক। পুরনো গানের রিমেক, রবীন্দ্রসঙ্গীত...। এক সেন্টিমিটার নাম করলেই বহু শিল্পীর লেজ মোটা হয়ে যায়, কিন্তু পিয়ালির পুচ্ছ মোটামুটি শেপেই ছিল। কবিতাদি তো পিয়ালি বলতে রীতিমত গদগদ তখন। পুত্রবধূ নাকি তাকে কথা দিয়েছে, সাহেবকে সে পুরোপুরি পালটে দেবে। শুনে ভাল লেগেছিল। প্রায় সাত বছর এ বাড়িতে ভাড়া আছি, সাহেবকে দেখছি কাছ থেকে। ছেলেটা এমনিতে মন্দ নয়, নেশা না করলে যথেষ্ট বিনয়ী, ভদ্র, শিষ্ট। অসম্ভব রূপবান। সাহেব তো সাহেবই। টকটকে রং, নীলচে চোখ, চওড়া কাঁধ, হাইট প্রায় ছ ফুট...। তার ঠাকুরদার মা নাকি মেম ছিল, সাহেব নাকি তার আদলটাই পেয়েছে। নেহাত মাকাল ফল নয়, গুণও আছে অজস্র। চমৎকার গান লেখে, সুর দেয়, বাজনাও বাজাতে পারে হরেক রকম। আমরা এখানে আসার পর পরই তো বিখ্যাত গায়ক সুরজিৎ রায় দলে ডেকে নিল তাকে, গিটারবাদক হিসেবে। তবে ওই যে, একটাই দোষ। নেশার দাস। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই, যখন ইচ্ছে বোতল খুলে বসে গেল। আর একবার মাতাল হল তো ব্যস, একেবারে বাপের কুপুত্তুর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যাকে তাকে খিস্তিখেউড় করছে, সিঁড়িতেই হয়তো ছড়ছড় মুতে দিল, রাস্তায় বেরিয়ে অকারণে হাতাহাতি করছে লোকজনের সঙ্গে, কিংবা হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নর্দমায়...। একদিন তো নিজের মাকেই বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিল, বেচারা কবিতাদি কোনও ক্রমে নেমে এসে আমাদের ঘরে আশ্রয় নেয়। এহেন সাহেবকে পিয়ালি যদি সত্যি সত্যি একটু সুস্থ জীবনে ফেরাতে পারে, তার চেয়ে আনন্দের খবর আর কী আছে!

প্রেম কী না পারে? মুককে' সে বাচাল করে দেয়, পঙ্গু তার গুঁতোয় অবলীলায় ডিঙিয়ে যায় পাহাড়। সাহেবের নেশা ছাড়ানো নিশ্চয়ই তার চেয়ে কঠিন কাজ নয়! কিন্তু কী হল শেষ পর্যন্ত? বিয়ের চারটে বছরও কাটেনি, একটা বাচ্চাও হয়ে গেছে, অথচ সাহেব ঘুরে ফিরে সেই পুরনো ফর্মে। পিয়ালি ছাড়া কাকেই বা এর জন্য দায়ী করব?

তবু ক্ষীণ প্রতিবাদ জুড়লাম; সাহেবের রক্তে অ্যালকোহল মিশে গেছে। মদ ছাড়া ও আর বাঁচতেই পারবে না।

তাপস ফুৎকার আমায় উড়িয়ে দিল,—বাজে কথা। সাহেব যে সত্যিই নেশা ছাড়তে চেয়েছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিয়ের পর প্রথম চার ছ মাস তো

দিব্যি ছিল। একটু আধটু টানুসটুনুস চলত হয়ত। কিন্তু কোনও সিন ক্রিয়েট করেছে কি তখন? সুবোধ গেরস্থর মতো সকালে উঠে বাজারে যাচ্ছে, বউকে নিয়ে রেকর্ডিংয়ে চলল, গানের ফাংশনে তাকে কম্পানি দিচ্ছে...। বউ রেওয়াজ করছে, সাহেব সঙ্গত করছে...দ্যাখোনি? শোননি? হঠাৎ সেই ছেলের নতুন করে মতি বিগড়োল কেন? প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই ঊর্ধ্বপানে তাকাল তাপস। দোতলার কোন্দল স্তিমিত হয়েছে খানিকটা। হঠাৎ হঠাৎ এক আধটা শব্দ ছুটে আসে, তবে তেমন ঝাঁঝাল নয়। নিজের অনুমান মিলে গেছে দেখে তাপস বুঝি আত্মপ্রসাদ অনুভব করল একটু। বিজ্ঞের মতো বলল,—আমি ডেড শিওর, সুরজিতের সঙ্গে পিয়ালি অত মাখামাখি না করলে সাহেব এখনও ঠিকঠাক থাকত।

আপনাআপনি ভুরুটা কুঁচকে গেল। খাদে গলা নামিয়ে বললাম,—সত্যিই কি পিয়ালি আর সুরজিতের মধ্যে কিছু আছে?

—নেই?

—কী জানি। অনেক সময়ে তো উলটোপালটাও রটে।

—কোনটা রটনা? সুরজিৎ রায় কি পিয়ালির গডফাদার নয়? পিয়ালিকে প্রোমোট করার জন্য সুরজিৎ কি লড়ে যাচ্ছে না? একটা অনুষ্ঠান তুমি দেখাতে পারবে সুরজিতের, যেখান পিয়ালি প্রেজেন্ট নেই?

—গানের জগতে একটু-আধটু ব্যাকিং তো লাগেই।

—মনকে চোখ ঠারা কথাবার্তা বোলো না তো। ভুলে যেও না, সুরজিতের গ্রুপ থেকে সাহেব কিন্তু এখন আউট। গিটারিস্টের পোস্টটা খারিজ হয়ে গেছে।

—সে তো সাহেব মাল টেনে সুরজিৎকে মারতে গিয়েছিল, তাই।

—কেন মারতে গিয়েছিল? সুরজিৎ তার বউকে নিয়ে হোটেলের দরজা বন্ধ করবে, আর সে চৌকাঠে বসে বসে বেহালার ছড় টানবে?

সত্যি-মিথ্যে জানি না, এরকম গুজব একটা আছে বটে। পিয়ালি বউ হয়ে আসার কিছুদিন পরেই তো জোর রটনা, সাহেব-পিয়ালির শুভ পরিণয়ে নাকি ঘোর অমত ছিল সুরজিতের। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নাকি রাজি করিয়েছে পিয়ালি।

শুনে তখন খারাপ লাগেনি। মনে হয়েছিল, এই তো প্রেম। মেয়েটা তার কেরিয়ারের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও সাহেবের হাত ধরেছে।

পরে অবশ্য গুজবটা অন্যভাবে পল্লবিত হল। সুরজিৎ রায় নাকি শর্ত সাপেক্ষে ওই বিয়েতে অনুমতি দিয়েছিল। বিয়ে করুক, কি নিকে, সুরজিতের প্রসাদ পেতে

হলে দূরের প্রোগ্রামে গডফাদারের সঙ্গে এক গাড়িতে থাকতে হবে পিয়ালিকে। এবং সাহেবের সেখানে স্থান নেই। সে যাবে আলাদা। বাজনদারদের সঙ্গে। রাতে হোটেলবাসের ক্ষেত্রেও নাকি একই রীতি। সাহেবের জন্য ভিন্ন ঠাঁই।

তখন বিশ্বাস হয়নি। সাহেবের মতো ছেলে কি এমন বন্দোবস্ত হজম করতে পারে? ফুলশয্যার রাত থেকেই তো তা হলে লাঠালাঠি বেঁধে যেত। এখন ভাবলে মনে হয়, গুজবটা বোধ হয় মিথ্যে ছিল না। মাতালরা তো মানুষ হিসেবে এমনিই একটু সাদাসিধে প্রকৃতির হয়, সে জায়গায় আমাদের সাহেব তো খুব বেশি রকমের সোজা সরল। হয়তো বা ভালবাসার ঔদার্যে, কিংবা প্রেমের মোহে, চোখ বুজে ছিল সে। সাময়িকভাবে। হয়তো ধারণা ছিল, পিয়ালি আস্তে আস্তে সুরজিতের কবল থেকে সরে আসবে। কিন্তু তেমনটা ঘটল না বলেই ক্ষোভ, হতাশা এবং আবার বোতল। মাঝে পুচকুন হওয়ার আগে ও পরেও বছর দেড়েক মোটামুটি শান্ত ছিল সাহেব। মাস দুয়েক হল পিয়ালি ফিরেছে গানের দুনিয়ায়, প্রোগ্রাম রেকর্ডিং করছে পূর্ণোদ্যমে। বেড়েছে সুরজিতের সঙ্গে দহরম মহরম। সাহেব তো ফের খেপবেই। মদ না পেটে পড়া পর্যন্ত যতই সভ্যভব্য থাকুক না কেন, নেশার ঝোঁকে বুকের জ্বালা তো ফুটে বেরবেই। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, বেচারার হাতে এখন কাজকর্মও নেই। ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটলে গান আসে? না সুর আসে?

তাপস রিমোট টিপে ইংরিজি সিনেমায়। দোতলাও নিঝুম ক্রমশ। রণক্লান্ত সাহেব সম্ভবত ঝিমিয়ে গেছে। বুবলির ঘরেও আলো নিভে গেল।

আমারও হাই উঠছিল। শোওয়ার ঘরে এলাম। টানটান হয়েছি বিছানায়। নাহ্, সাহেবকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে লাভ নেই, দোষের পাল্লাটা পিয়ালির দিকেই ঝুঁকছে বেশি। কিন্তু এভাবে চলবে কদ্দিন?

তা অনেক দিনই চলল। প্রায় মাস ছয়েক। কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে। কখনও বা টেনে-হিঁচড়ে। ঝগড়া বিবাদ তো প্রতি রাতেরই রুটিন ইভেন্ট এখন। কোনও দিন মাত্রা চড়ে তো কোনও দিন নিচু পরদায় বাঁধা। তবে রোজ একচোট হবেই হবে, এ আমরা বুঝে গেছি। যদি কোনও দিন সময়মতো কাজিয়া না বাঁধে, আমাদেরই কেমন গা ম্যাজম্যাজ করে, ঘুম আসতে চায় না। বুবলি পর্যন্ত উশখুশ করে। আচমকা প্রশ্ন করে বসে, কাকু-কাকিমা কি আজ বাড়ি নেই? তারপর হঠাৎ বেশি রাত্রে সাহেব মেমসাহেবের ঝঙ্কার বেজে উঠলে আমি আর তাপস চোখ চাওয়াচাওয়ি করি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অথবা দীর্ঘশ্বাস। অন্য একটা পরিবারের অশান্তি কখন যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে

গেছে, ভেবে বিস্মিত হই। তবে দিনেরবেলাটা কিন্তু ভারি অন্যরকম। তখন গৃহে শান্তিই শান্তি। পুচকুন ছাড়া আর কারও গলা উচ্চগ্রামে ওঠে না তখন। মাঝে মাঝে কানে আসে ছেলেকে গান শেখাচ্ছে সাহেব। প্রায়শই সাড়ে দশটা এগারোটায়, কিংবা তার কিছু আগে-পরে সেজেগুজে বেরিয়ে যায় পিয়ালি। হয়তো রিহার্সাল। হয়তো রেকর্ডিং। কিংবা হয়তো নিছকই কোনও অন্য কাজ। পিয়ালি এখন কাজে ভাসছে। পিয়ালি কাজে ডুবে আছে। কখনও সখনও পুচকুনকে কোলে করে সাহেব তার সঙ্গে যায় মোড় পর্যন্ত, তারপর বাচ্চার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা করতে করতে ফিরে আসে। বিকেলেও বেরোয় ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে। পার্ক, রাস্তা, চায়ের দোকান, সর্বত্রই পুচকুন তার সঙ্গী। এক-আধ দিন, নিতান্ত কালেভদ্রে, গিটারের বাক্স হাতে বেরোতে দেখা যায় সাহেবকে। রাস্তায় নেমে অনেকক্ষণ ধরে টা টা করে ছেলেকে। মুখোমুখি পড়ে গেলে আমাদের সঙ্গেও দু-চার কথা বলে, কুশল প্রশ্ন করে। আগের মতোই। এত নম্র স্বর, অথচ এই ছেলেই রাতে দানব...কী করে যে হয়?

মেলে না, হিসেব মেলে না।

হঠাৎই এক দুপুরে কবিতাদি এল নীচতলায়। পুচকুনকে নিয়ে। ইদানীং কবিতাদির আসা-যাওয়া অনেক কমে গেছে, আমি তাই কিঞ্চিৎ অবাক।

হালকাভাবে বললাম,—নাতিকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন, অ্যাঁ? দোতলা থেকে আর নামারই সময় পান না!

কবিতাদি ম্লান হাসল। আগের মতো চেহারায় আর জৌলুস নেই, কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখায়। কপালে বলিরেখা ফুটে বেরিয়েছে, রোগাও লাগে খুব। সাহেবের বিয়ের পর যেন দুম্ করে বুড়িয়ে গেল।

পুচকুনকে আমার কোলে দিয়ে কবিতাদি বলল,—সত্যিই সময় পাই না গো। পুচকুনকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, ঘুমোলে তার কাছাকাছি থাকা...। ছেলের মা তো জন্ম দিয়েই খালাস, সব দায়দায়িত্ব এখন আমার ঘাড়ে।

—এ তো সুখের দায়, কবিতাদি।

—আর সুখ! কবিতাদি ফোঁস করে শ্বাস ফেলেল,—সুখ বস্তুটি আমার কপালে নেই, এ আমি বুঝে গেছি। অসুখ নেই, বিসুখ নেই, রোগী দেখতে দেখতে পুট্ করে জলজ্যান্ত মানুষটা মরে গেল। কীই বা বয়স হয়েছিল তার? পঞ্চান্ন। তারপর তো...। ভেবেছিলাম, ছেলে বিয়ে করলে সংসারটা একটু হাসিখুশি হবে। কপালের লিখন যাবে কোথায়, জুটল এক বজ্জাত বউ। ঘরসংসার আরও ফালাফালা করে দিল।

কথাগুলো ঠং করে বাজল কানে। কবিতাদির কণ্ঠে এমন হতাশার সুর শুনিনি কখনও। কারও নিন্দেমন্দও না। পিয়ালির ব্যাপারে তো রীতিমতো পঞ্চমুখ ছিল। নাহ্, কবিতাদি সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছে।

কবিতাদি বলেই চলেছে,—তোমাদের আর কী লুকোব, চোখের সামনেই তো দেখছ সব। পিয়ালি তো এখন কথায় কথায় হেনস্থা করছে আমার সাহবকে। উঠতে বসতে টিজ। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি খোঁচা। পুচকুনকে নিয়ে যে আহ্লাদ করে বেরোচ্ছ, ট্যাকে পয়সা আছে তো? লজেন্স ললিপপ চাইলে কিনে দিতে পারবে? নাকি এক টাকা, দু টাকা দিয়ে যাব? ...ভাবো তুমি, ছেলেটার এখন তেমন রোজগারপাতি নেই, কোথায় তার সঙ্গে একটু সিমপ্যাথেটিক ব্যবহার করবি, তা নয়...। ঘরে দুটো পয়সা আনে বলে বড্ড গুমোর। তাও যদি না জানতাম কোত্থেকে কী হচ্ছে।

কবিতাদির মুখ থেকে এত নিন্দামন্দ ভাল লাগছিল না। পুচকুনকে নামিয়ে খাটে বসালাম। বুবলির একটা পুরনো খেলনাগাড়ি হাতে ধরিয়ে দিয়ে কবিতাদিকে বললাম,—যাই বলুন, আমাদের পুচকুন কিন্তু দারুন মিষ্টি হয়েছে। একেবারে দেবশিশু।

প্রসঙ্গ ঘুরল না। কবিতাদি আবার একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল,—ওকে দেখেই তো আমার আরও কষ্ট হয়। অত সুন্দর একটা শিশু, তার দিকেও কি সেভাবে ফিরে তাকায় বউটা? এই তো সে দিন ছেলেটার গা ছ্যাঁকছ্যাঁক, দেখেও মা দিব্যি নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। ভিডিও অ্যালবাম হচ্ছে, উনি মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে তার শ্যুটিং করবেন। সাহেবটা বোকার ডিম, সে আবার সোহাগ দেখিয়ে বউকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল। রাতে যার সঙ্গে লাঠালাঠি, দিনে তার ওপর অত সোহাগ কী করে জাগে আমি বুঝি না।

হেসে বললাম,—ওটাই আজকালকার ভালবাসা, কবিতাদি। কখনও হাতে তলোয়ার, তো কখনও গোলাপফুল। সাহেব আর পিয়ালিও এইভাবে লড়ে লড়ে কাটিয়ে দেবে জীবনটা।

কবিতাদির মুখ ভার হল,—পিয়ালি কীভাবে জীবন কাটাবে জানি না। তবে আমার ছেলেটার জীবনটা যে নষ্ট করে দিল, এ আমি খুব টের পাই।

গভীর যন্ত্রণা থেকেই হয়তো উৎসারিত হল অভিযোগটা। কিন্তু আমার কেন যেন হাসি পেয়ে গেল। সাহেবের জীবন কি শুধু বিয়ের পর নষ্ট হয়েছে? পাড়ার লোকেরা তো বলে, মায়ের আদরে আদরে বহুকাল আগেই বিগড়েছে সাহেব। সীতাংশু ডাক্তার রোগী চেম্বার নিয়ে ব্যস্ত, সংসারের দিকে তাকানোর ফুরসত

নেই, ও দিকে তার বউ যথেচ্ছ লাই দিয়ে চলেছে ছেলেকে। মুখ থেকে আবদারটুকু খসলেই হল, যা চাই হাজির। দামি দামি জামা, জুতো, টেপ, ওয়াকম্যান, সানগ্লাস, পারলে আকাশের চাঁদও। সঙ্গে কাঁচা পয়সা তো আছেই। এ ছেলের পরিণাম কি ভাল হতে পারে? কুসঙ্গের কৃপায় নাইন টেন থেকেই ড্রাগের খপ্পরে পড়ল সাহেব, ঘষটে ঘষটে স্কুল টপকে ইতি টানল পড়াশোনায়। ডাক্তারবাবু বেঁচে থাকতে বার দুয়েক নাকি নেশা ছাড়ানোর হোমেও রাখা হয়েছিল ছেলেকে। লাভের মধ্যে লাভ, ছিল শুকনো নেশা, ধরল তরল। ওই সময়ে কে তাকে জুগিয়েছে বোতলের পয়সা? কবিতাদি কি সব ভুলে গেল? নাকি নিজের অপরাধের বোঝা বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে মনে মনে? কিংবা হয়তো পিয়ালির ওপর খুব বেশি ভরসা করেছিল, আশাভঙ্গের জ্বালায় ছটফট করছে এখন!

কোনও মন্তব্য করলাম না। কবিতাদি আরও খানিকক্ষণ বকবক করল একটানা। ঘুরে ফিরে একই কথা। পিয়ালি কত নির্লজ্জ, সুরজিতের সঙ্গে ঢলাঢলিটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, আত্মীয়মহলে পিয়ালিকে নিয়ে কেমন ঢিঢি পড়ে গেছে, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ। শুনতে শুনতে আমারও রাগ হচ্ছিল পিয়ালির ওপর। কেন মিছিমিছি লোক দেখানো বউ সেজে থাকা, এবার মানে মানে কেটে পড়লেই তো পারে।

অবশেষে দিনটা এল। সন্ধে থেকেই সে কী তুলকালাম কাণ্ড! প্রথমে নিয়ম মাফিক ঠাঁইঠকাঠক, তারপর দুমদাম। টেবিল পড়ছে, চেয়ার ভাঙছে, কাপ ডিশ হাতা খুন্তি, কী যে ছোঁড়াছুড়ি চলছে কে জানে! তার মাঝেই সাহেবের গাঁক্‌গাঁক্‌, পিয়ালির চিলচিৎকার। হঠাৎ হঠাৎ কবিতাদির স্বরও শোনা যায়। সঙ্গে পুচকুনের কান্না।

তাপসকে বললাম,—আজ মনে হচ্ছে একটু বেশি বাড়াবাড়ি?

—হুম্‌। কবিতাদিও যুদ্ধে জয়েন করেছে। পিয়ালির কপালে দুঃখ আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সিঁড়ির দরজায় গুমগুম ধাক্কা। পাল্লা খুলতেই হুড়মুড় ঢুকে পড়েছে কবিতাদি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—এই, তোমরা একটু চলো প্লিজ। সাহেবকে একদম রোখা যাচ্ছে না।

লড়াই থামাতে আমরা একেবারেই যে যাই না, তা নয়। লাগাতার চলতে থাকলে এক-আধ দিন তো নাক গলাতেই হয়। পারতপক্ষে বোবা কালা সেজে থাকারই চেষ্টা করি। বিশেষ করে তাপস তো মোটেই ঝুটঝামেলায় ভিড়তে চায় না।

আমাদের ইতস্তত ভাব দেখে কবিতাদি আবার বলল,—তোমরা কেউ না এলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। সাহেব আজ মারধর করছে, তোমরা না আটকালে...

এটা নতুন সংযোজন। সাহেব তেড়ে তেড়ে যায় বটে, কখনও হাত চালায় না! মাকে হয়তো একদিন মারতে তাড়া করেছিল, পিয়ালিকে তো পেটায়নি কোনও দিন! জিনিসপত্র ভাঙচুর করা অবধিই তার দৌড়। আজ সীমা লঙ্ঘন করল যে বড়?

প্রশ্ন করার সময় নেই, দুদ্দাড়িয়ে ছুটলাম ওপরে। গিয়ে দেখি গোটা বাড়িই প্রায় লণ্ডভণ্ড। ভেতর বারান্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভাঙা কাপ ডিশ, ফুলদানি, ছবির ফ্রেম, মোবাইল ফোন, পিয়ালির ভ্যানিটিব্যাগ, হেয়ারড্রায়ার, লিপস্টিক, আইলাইনার, নেলপালিশ, ব্রাশ...। সাহেবদের ঘরটার তো অকহতব্য দশা। ড্রেসিংটেবিলের টুল উলটে আছে দরজার সামনে, টেবিল কেতরে পড়েছে দেওয়ালে, চেয়ারটাকে তো দেখাই যাচ্ছে না, মেঝেয় বিছানা বালিশ ছত্রাকার, একখানা সুটকেস আর পিয়ালির একগাদা শাড়ি শালোয়ার লুটোপুটি খাচ্ছে যেখানে সেখানে। দামি মিউজিক সিস্টেমটারও লাথি ফাতি খেয়ে কি হাল!

এত সব কিছুর মধ্যিখানে কপালে হাত চেপে বসে আছে পিয়ালি। ঝামর ঝামর চুল, কাজল ধেবড়ানো চোখ, মূল্যবান কামিজের কাঁধ ছিঁড়ে ফরদাফাই। কপাল তার সত্যিই খারাপ, রক্ত ঝরছে কপাল বেয়ে।

সাহেবও ঘরেই মজুত। পা টলটল, কিন্তু তর্জনী তুলে গর্জে চলেছে জান্তব ভাষায়। নেশায় লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে যেন।

আমাদের দেখেই সাহেবের তেজ বুঝি বেড়ে গেল আচমকা। দু হাত ছড়িয়ে বলল,—দিয়েছি আজ শালির মাথা ফাটিয়ে। আমার সঙ্গে তিকড়মবাজি, অ্যাঁ?

পিয়ালি কপালে হাত চেপেই ফুঁসে উঠল,—কিসের এত রুস্তমি দেখাচ্ছ, শুনি? তিন পয়সার মুরোদ নেই, তিন টাকার ঝাল! আমি তোমার থোড়াই পরোয়া করি।

—অ্যাই শালি, চোপ। আর একটা কথা বললে গলা টিপে মেরে দেব।

—আর একবার গায়ে হাত তুলে দ্যাখ্। তোর কোমরে যদি যদি দড়ি না পরাই...! তোর মতো একটা কুত্তার ভুকভুকানিতে আমি চুপ করব? যা ভাগ্। ফোট্। তুই আমায় খাওয়াস, না পরাস? আমি তোকে পুষছি, বুঝলি, আমি তোকে পুষছি।

—কী? কীই?

সাহেব প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি, তাপস দৌড়ে গিয়ে জাপটে ধরল তাকে,—কী হচ্ছে সাহেব? চলো বাইরে চলো।

—আমি কেন যাব? ওই ছেনালটা বেরিয়ে যাক। তিন দিনের জন্য ইয়ে মারাতে যেতে চাইছিল না? চিরদিনের জন্য যাক।

—শুনছ বউদি? শুনছ মুখের ভাষা? পিয়ালি আমায় সাক্ষী মানল,—শিলিগুড়িতে প্রোগ্রাম করতে যাব, শুনেই বাবু হিংসেয় জ্বলছে। আশ্চর্য, নিজে বেকার বলে আমাকেও কাজকর্ম করতে দেবে না?

তাপসের টানে সাহেব দু পা হঠেছিল, ফের ছ-ফুটি দেহটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—যা না মাগি, কর না যা খুশি। তবে এ-বাড়িতে আর পা রাখবি না, বলে দিলাম। আজ মাথায় অ্যাশট্রে ভেঙেছি, এরপর হাতুড়িপেটা করে ঘিলু বের করব।

—আমার বয়ে গেছে আর এখানে ফিরতে। দয়া করো তোর সঙ্গে থাকতাম, বুঝলি! নেশা ছুটলেই তো পায়ের কাছে লু লু করিস। লজ্জাও করে না। থু থু।

বলেই উঠে দাঁড়িয়েছে পিয়ালি। কপালের রক্ত হাতের চেটোয় মুছল ঘষে ঘষে। একবার দেখল হাতখানা। কামিজের ছেঁড়া কাঁধটাও। কামিজেই হাত মুছে সটান গিয়ে আলমারি খুলল। উলটানো সুটকেসখানা সোজা করে ঝপাং ঝপাং জামাকাপড় পুরছে তাতে। সাহেবকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে তাপস, আমি আর কবিতাদি নীরব দর্শক।

পিয়ালির দাপাদাপি দেখতে দেখতে হঠাৎই কবিতাদি বলে উঠল,—কী করছ তুমি? এক্ষুনি চললে নাকি?

কটমট চোখে শাশুড়ির দিকে তাকাল পিয়ালি, জবাব দিল না। মেঝেয় ছড়ানো পোশাকআশাক তুলছে এবার।

কবিতাদি মিনমিন করে বলল,—মাথা ঠাণ্ডা করে পিয়ালি। যেতে হয়, কাল সকালে যেও।

—কেন? আমার কপাল ফাটায় আপনার সুখ হয়নি বুঝি? চান রাত্তিরবেলা আমি খুন হয়ে যাই?

—ছি ছি, কী বলছ! রাগের মাথায় একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে...!

—উঁউঁউঁহু, একদিন! শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন না। রোজই যে আমার কপাল ফাটে না, এ আমার সাতপুরুষের ভাগ্যি।...কোত্থেকে যে একটা অমানুষের জন্ম দিয়েছিলেন?

—ভাষা ঠিক করো, পিয়ালি। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে শেখো।

—গুরুজন দেখাবেন না। বাক্স গোছানো থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছে পিয়ালি। আঙুল নেড়ে কবিতাদিকে দেখে বলল,—বউদি, এই মহিলাটিকে চিনে রাখুন। এঁকে দেখে যেমনটা মনে হয়, মোটেই ইনি সেরকম নন। পেয়ারের ছেলেকে ইনিই দিনরাত তাতান। বউয়ের নাম যশ সহ্য করতে না পেরে ইনিও জ্বলেপুড়ে মরছেন।

কবিতাদির দু চোখ বিস্ফারিত। মুখে বাক্যি সরছে না। আমি ধমকে উঠলাম,—কী যা তা বলছ?

—ঠিকই বলছি। মা নেই বলে প্রথম প্রথম এসে খুব মা মা করতাম তো! উচিত শিক্ষা দিয়েছেন আমাকে। আপনারাও একদিন ওঁকে চিনবেন।

ঘটাং ঘটাং সুটকেস বন্ধ করল পিয়ালি। টেনে টেনে নিয়ে সিঁড়ির মুখে। তারপর সুড়ুৎ করে ঢুকে গেছে শাশুড়ির ঘরে। পুচকুন ভ্যাবলার মতো ঠাকুমার বিছানায় বসে। খপাৎ করে তাকে কোলে তুলে নিল। গটগট বেরিয়ে যাচ্ছে।

কবিতাদি হাউমাউ করে ছুটে গেল,—করছ কী? পুচকুনকে নিয়ে চললে কোথায়?

পিয়ালি কেটে কেটে বলল,—আমি যেখানে থাকব, পুচকুনও সেখানে থাকবে।

—কক্ষনও না। পুচকুন আমার কাছে থাকে...

—তাতেই তো আপনি ওর মা হয়ে যাননি!

সাহেবকে মোটামুটি ঠাণ্ডা করে বাইরের ঘরে বসিয়েছিল তাপস, মা বউয়ের উত্তেজিত সংলাপ কানে যেতে আবার সে রে রে তেড়ে এসেছে। গর্জে উঠল,—খবরদার। পুচকুনকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। ও এই বাড়ির ছেলে, এখানেই থাকবে।

—এখন কেন, অ্যাঁ? একটু আগেই তো চেল্লাচ্ছিলে, পুচকুন তোমার ছেলে নয়। আমি নাকি অন্য কারও সঙ্গে শুয়ে পেট বাধিয়ে এসেছিলাম!

পলকের জন্য থমকাল সাহেব। পর মুহূর্তে ফেটে পড়েছে,—বেশ করেছি বলেছি। শোও না তুমি ওই শুয়োরটার বিছানায়?

—হাজার বার শোব। লক্ষ বার শোব। পুচকুনকেও নিয়ে যাব। দেখি কী করে আটকাও।

—তবে রে মাগি...! দে, আমার ছেলে দে। তোর খানকিপনা আজ যদি না ঘুচিয়েছি...

ইস্, এবার তো কানে আঙুল দিতে হয়। দেড় বছরের বাচ্চাটাকে নিয়ে

দুজনে হেঁচড়াহেঁচড়ি করছে, এ দৃশ্যও তো চোখে দেখা যায় না।

অসহায়ভাবে কবিতাদিকে বললাম,—আপনি তো ওদের মতো পাগল হয়ে যাননি, ছেলেকে থামান। এরপর তো থানাপুলিশ হয়ে যাবে। অতটুকু শিশু মায়ের কাছেই থাকবে, আইন আদালত কেউ আটকাতে পারবে না।

জোরজার করে সাহেবকে সরাতে কালঘাম ছুটে গেল। ছেলে কোলে, সুটকেস হাতে, শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করল পিয়ালি।

সাহেব ঘাড় লটকে বসে পড়েছে সোফায়। কবিতাদি নিথর। আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। খানিকক্ষণ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এলাম নীচে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। তাপস মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল,—উফ্, ঝড় না ঝড়! আমায় এক গ্লাস জল খাওয়াও তো!

বুবলি জুলজুল চোখে আমাদের দেখছিল। বড় হচ্ছে, বারো পুরে তেরোয়, সবই বুঝতে পারে এখন। ছুটে ফ্রিজ থেকে জল এনে করুণ মুখে বলল,—পুচকুনকে নিয়ে গেল?

গোমড়া মুখে বললাম,—হুঁ।

—কাকিমাটা ভীষণ পাজি। বেচারি দিদা এখন কী নিয়ে থাকবে?

তাপস জল শেষ করে বলল,—কেন, তোর দিদার গুণধর ছেলে তো রইল।

মেয়ের সামনে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—হ্যাঁ, মায়েরও কপাল ফাটল। এবার কবিতাদিকেই তো আবার দুরমুশ করবে সাহেব।

মানুষ এক আজব জীব। কখন যে তার মতি পালটায়, কীভাবে যে স্রোতের মুখ অন্য দিকে ঘুরে যায়, তা বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। কিছুতেই হিসেব মেলানো যায় না।

সেই রাতের পর থেকে সাহেব একেবারে অন্যরকম। উদাস মুখে ঘুরে বেড়ায়, কারও সঙ্গেই কথা বলে না বড় একটা। মদ খাওয়া পুরোপুরি ছাড়তে পারেনি, কিন্তু হল্লাগুল্লা আশ্চর্যরকমভাবে বন্ধ। মাতাল হলেও টের পাওয়ার উপায় নেই। রাতের দিকে টুং টাং গিটার বাজায় মাঝেসাঝে, অথবা সুর তোলে সিন্থেসাইজারে। নয়তো দোতলার বারান্দায় বসে থাকে নিঝুম।

কবিতাদি তো ছেলে নিয়ে রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেছে। প্রায়ই এসে আক্ষেপ করে,—কাজটা কিন্তু ন্যায় করল না পিয়ালি। পুচকুনটাকে কেড়ে নিয়ে গেল! দেখছ তো, সাহেবের কী দশা! গুম হয়ে থাকতে থাকতে ছেলেটা পাগল টাগল না হয়ে যায়।

সাহেব কি শুধুই পুচকুনের শোকে কাতর? নাকি পিয়ালি বিহনেও? কিন্তু কবিতাদি যে নাতির সঙ্গে বিচ্ছেদটা কোনওভাবেই মন থেকে মানতে পারছে না, এ তার চেহারাতেই প্রকট। বয়স যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কেমন শীর্ণও হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কবিতাদিকে দেখে যেন বেশি মায়া জাগে।

একদিন বলেই ফেললাম,—সাহেবকে সরাসরি যেতে বলুন না। পুচকুনকে এক-আধ দিন নিয়ে আসুক। তাকে দেখার রাইট তো আপনাদের আছে।

কবিতাদি ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—পিয়ালি ও সব মানে নাকি? সাহেব তো মান খুইয়ে তার কাছে গিয়েছিল, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—পিয়ালি এখন কোথায়? সেই বজ্জাতটার সঙ্গে?

—না না, বাপের বাড়িতে।

—তা আপনি সেখানে একবার ফোন করুন না। পিয়ালি না হোক, তার বাপ-দাদাদের বুঝিয়ে বলুন।

—সে চেষ্টা কি করিনি? ওরা কথাই বলে না। আমার নাম শুনলেই লাইন কেটে দেয়।

—ভীষণ অসভ্য তো! সাহেবকে বলুন উকিলের চিঠি দিতে। বাপ বাপ বলে ছেলে দেখিয়ে যাবে।

—নাতির জন্য শেষে কোর্টকাছারি করব?

তা কবিতাদির দ্বিধা থাকলেও আদালতে যেতেই হল শেষ পর্যন্ত। পিয়ালি নোটিস পাঠাল ডিভোর্সের। এ দিকে আমাদেরও বাড়ি তৈরি শুরু হয়ে গেছে, সকাল বিকেল ছুটতে হচ্ছে গড়িয়ায়। হয় আমি যাই, নয় তাপস। একজন কেউ না দাঁড়ালে কন্ট্রাক্টর কাজে ঢিলে দেবে, দু নম্বরি মালমশলাও চালাবে দেদার। মধ্যবিত্তের ঘরবাড়ি, এ তো প্রায় স্বপ্নপূরণ। নিজেই ঘুরে ঘুরে ইট বালি লোহা কিনছে তাপস। তবু শত ব্যস্ততার মাঝেও উকিলের কাছে নিয়ে গেল সাহেবকে। লড়ালড়ি করেও পুচকুনের দখলদারি পেল না বেচারি। একে পুচকুন পাঁচ বছরের কম, তার ওপর সাহেবের রোজগার মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়, মোদো মাতাল বলেও সে সুবিদিত। অতএব পুচকুনের ভার যে পিয়ালিতেই বর্তাবে, এ তো অবধারিত। পিয়ালির ব্যভিচারের ব্যাপারটা কে জানে কেন আদালতে তুলতে চায়নি সাহেব। তুললেও ধোপে টিকত কি না সন্দেহ। প্রমাণ কোথায়?

যাই হোক, ঘন মেঘে একটাই রুপোলি রেখা। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, সপ্তাহে একদিন বাবার কাছে যাবে পুচকুন। এটুকই বা কম কী?

শনি রবি নয়, সপ্তাহের মাঝে কোনও একটা দিন পিয়ালি নিজেই পৌঁছে

দিয়ে যায় পুচকুনকে। নিজের বেশি কাজের দিনগুলোই সম্ভবত বেছে নেয়। কিনেছে না পেয়েছে কে জানে, আসে একটা মারুতি হাঁকিয়ে। কায়দা করে চুল ছেঁটেছে, চোখে দামি সানগ্লাস। গাড়ি থেকে নামে না কক্ষনও, ড্রাইভারকে নিয়ে তিন বার প্যাঁক প্যাঁক হর্ন বাজায়, ছেলে বাড়িতে ঢুকে গেলে বেরিয়ে যায় হুশ করে। রাতে পুচকুনকে তুলতে ড্রাইভারই আসে শুধু, গাড়িতে ক্বচিৎ কখনও পিয়ালিকে দেখা যায়।

বেশ একটা কেউকেটা কেউকেটা ভাব এসেছে পিয়ালির। কায়দা মেরে বসে থাকে পিছনের সিটে। একদিন জানলা থেকে ভদ্রতা করে একটু হেসেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে কালো চশমা ঢাকা মুখখানা ঘুরিয়ে নিল। যেন মিলিবউদিকে সে চেনেই না। চিনলি না তো চিনলি না, মিলিবউদির তাতে বয়েই গেল। আমি আজকাল হর্ন শুনলেই বন্ধ করে দিই জানলা। শব্দ করে।

নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি প্রায় দেড় বছর। প্রথম কটা মাস তো গোছগাছ করতেই কেটে গেল। এটা কিনছি, ওটা কিনছি...আলমারি একবার এ দেওয়ালে রাখি, তো একবার ও দেওয়ালে, খাটবিছানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি বার বার। একটা ঘরে মোজাইক বাকি ছিল, ছাদের সিঁড়িতে আধাখোঁড়া, ঢোকার পরে শেষ করতে হল কাজগুলো। টুকটুক করে সাজিয়েও ফেললাম বাড়িখানা। অ্যাদ্দিনে মনে হচ্ছে থিতু হয়েছি মোটামুটি। শহরের মধ্যমণি অঞ্চল থেকে প্রায় শহরতলিতে চলে এসে বুবলির মনখারাপ হয়েছিল খুব। এখন দিব্যি সয়ে গেছে। এ-পাড়াতেই এখন তার কত বন্ধুবান্ধব। তাপসের অবশ্য এখনও একটু খুঁতখুঁতুনি আছে, অফিসটা দূরে হয়ে গেছে কি না।

কবিতাদির সঙ্গে আর তেমন যোগাযোগ নেই। গোড়ার দিকে ফোনাফুনি চলত বেশ, কবিতাদি বাড়িটা দেখেও গেছে। তারপর আস্তে আস্তে কীভাবে যেন সুতোটা ঢিলে হয়ে গেল। এখন ন' মাসে ছ মাসে ফোন, কেমন আছেন, ভাল আছি, ব্যস। নতুন বাড়ি, নতুন পাড়া, বুবলি, সংসার নিয়ে এমন মজে আছি, ভবানীপুরের বাড়িটার সেই কলহ অশান্তির কথা আর মনেই পড়ে না সেভাবে। উঁহুঁ, আসে স্মরণে। হঠাৎ হঠাৎ। পিয়ালির দৌলতে। পিয়ালির এখন ভালই নামডাক। নক্ষত্র না হলেও সে এখন একজন সেলিব্রিটি। এফ-এম চ্যানেলে পিয়ালির আধুনিক গান শোনা যায়, টিভির পরদায় দেখা যায় তার ভিডিও অ্যালবাম। হড়কা বানের মতো স্মৃতিগুলো ধেয়ে আসে সহসা। ঝপ্ করে রেডিও-টিভি বন্ধ করে দিই।

হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে তাপস বলল,—তোমাকে একটা স্কুপ দিতে পারি, বুঝলে। সাহেবের এক্স-ওয়াইফ নাকি ঠাঁই বদল করেছে।

হেসে বললাম,—তুৎ, ও খবর তো ঠোঙা। বাপের বাড়ি ছেড়ে সুরজিতের ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে তো...?

আরে বাবা, না। সুরজিৎ রায়ও এখন পাস্ট টেন্স। শি হ্যাজ লেফট হিম।

সে কী? কেন? কবে কোথায় আছে এখন?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, একবারে অত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় নাকি? সুরজিৎকে ছাড়ার এগ্‌জাক্ট দিনক্ষণ আমি বলতে পারব না তো। তবে ছেড়েছে। আমাদের অফিসের দীপেনের ভাই তো রেকর্ডিং স্টুডিওয় চাকরি করে, সেই ঘোড়ারই মুখের খবর। সুরজিৎকে নাকি বিয়ের জন্য খুব চাপাচাপি করেছিল পিয়ালি...তা সে তো মহা ঘোড়েল, নিজের বউ বাচ্চাকে সে ছাড়বে না...তাই নিয়ে দুজনের হেভি ফাটাফাটি। দীপেনের ভাইদের স্টুডিওতেই নাকি সুরজিৎ আর পিয়ালি একদিন ফ্রি শো দেখিয়েছে। বক্সিংয়ের। ব্যাস্, তার পরেই কাট্টি। বাক্সপেঁটরা গুছিয়ে পিয়ালি এখন অন্য নৌকোর ছইয়ে। বিদ্যুৎ ভট্‌চাজ...ওই যে ফিল্মে মিউজিক টিউজিক দেয়...তার সঙ্গে লিভটুগেদার করছে।

বিজাতীয় উল্লাস হল শুনে। বললাম,—জানতাম এই মেয়ের এই গতিই হবে। ঘাটে ঘাটে জল খেয়ে বেড়াতে হবে এবার।

—অত সোজা ইকুয়েশনে যেও না। তাপস গুছিয়ে বসল,—পিয়ালি অত্যন্ত চালু। মেপেজুপেই এগোচ্ছে। সুরজিৎকে ওর নিংড়ানো কমপ্লিট। পরিচিতির দরকার ছিল, সুরজিৎ সেটা ওকে পাইয়ে দিয়েছে। পিয়ালির যা ক্যালি, তার চেয়ে বেশ খানিকটা ওপরেই ওকে ঠেলে দিয়েছে। পাম্প মেরে মেরে তো আর লতা মুঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখার্জি বানানো যাবে না। অথচ পিয়ালি মার্কেটে টিকে থাকতে চায়। সে দিক দিয়ে ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর তো আইডিয়াল চয়েস। তাই বিয়ের বাহানায় সুরজিৎ আউট, বিদ্যুৎ ইন। ভট্‌চাজের পো ওকে ব্রেক দিতে পারলে ভাল, নইলে আর কাউকে ধরবে।

—আর পুচকুন? সে এখন কোথায়?

—মার সঙ্গেই আছে নিশ্চয়ই।

—পাঠায় ও বাড়ি?

—কী করে বলব? হয়তো পাঠায়।

—পুচকুনটাও মানুষ হবে না। কেন যে জেদ করে ছেলেটাকে নিয়ে গেল!

—সাহেবের কাছে থাকলেও কি মানুষ হত?

লাখ টাকার প্রশ্ন। উত্তর হয় না। একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে বললাম,—একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না। পিয়ালি তো নিজের কেরিয়ার ছাড়া আর কিছুই বোঝে না...ওর মতো একটা অ্যাম্বিশাস মেয়ে সাহেবকে আদৌ বিয়ে করেছিল কেন? যখন ওই সময়েই সে সুরজিতের ঘাটে নোঙর ফেলে রেখেছে?

—ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। সাহেবের রূপ, ম্যাসকিউলিনিটি, ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তুলনায় সুরজিতের যা বদখৎ চেহারা!

—তার মানে সাহেবের ওপর প্রেমটা মোহ ছিল বলছ?

—তা ছাড়া কী! চোখের রং যখন ফিকে হল, তদ্দিনে সে প্রেগন্যান্ট। এবং ওই মেয়ে যে তখন বাচ্চাটাকে নষ্ট করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেনি, এটাই পুচকুনের ভাগ্য।

—কিংবা পুচকুনের দুর্ভাগ্য।

লঘু স্বরে বললাম বটে, কিন্তু বুকটা কেমন ভারী হয়ে গেল সহসা। পুচকুনের পাশাপাশি কবিতাদির মুখটাও মনে পড়ল। নাতি যে দিন হল, অদ্ভুত একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছিল কবিতাদির মুখেচোখে। পিয়ালি আলোটা মুছে দিয়েছে। ছেলেটাকেও তো একটা বাজে পরিবেশে নিয়ে গেল। পুচকুন এখন যেভাবে আছে, কবিতাদির বাড়ির পরিবেশ তার চেয়ে খারাপ ছিল কী? কবিতাদির খুব আশা ছিল, নাতি বড় হয়ে ডাক্তার হবে। দাদুর মতো। ওই পিয়ালির ছায়ায় থেকে তা কি সম্ভব? বেচারা কবিতাদির কোনও মনস্কামনাই বুঝি পূর্ণ হওয়ার নয়। নাহ্ কবিতাদিকে মাঝে মাঝে ফোন করা উচিত। কারও সঙ্গে দুটো চারটে কথা বললেও তো মানুষের মন খানিকটা হাল্‌কা হয়।

পরদিনই টেলিফোন করলাম। রিং বেজে গেল। কোথাও বেরিয়েছে কি? থাক, পরে দেখা যাবে।

কিন্তু যা হয়। গড়িমসি। কবিতাদিকে আবার ভুলে গেলাম।

মাস দুয়েকও কাটেনি, হঠাৎ চরম দুঃসংবাদ। কবিতাদির নাকি ক্যানসার।

খবরটা এনেছে বুবলি। আমাদের আগের পাড়ার সংঘমিত্রা বুবলিদের স্কুলে পড়ে, তার কাছে শুনেছে আজ। আমি হতভম্ব,—কবে হল? কি করে হল?

শুক্‌নো মুখে বুবলি বলল,—বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি ভুগছিল। পেটে ব্যথা, যখন তখন বমি, পটির সঙ্গে রক্ত পড়ছে...। সাহেববাবু গোস্বামী ডাক্তারকে দেখাচ্ছিল। উনিই ক্যানসারের টেস্ট করতে বলেছিলেন। তখনই ধরা পড়ল...

—ও। এখন কী অবস্থা?

—ভাল নয় বোধ হয়। হসপিটালে ভর্তি আছে। ঠাকুরপুকুরে।

এই হচ্ছে ভাঙা কপাল। বাধল তো বাধল, একেবারে সম্রাটের রোগ। জলের মতো টাকাও বেরিয়ে যাবে এখন। কত আর সঞ্চয় আছে কবিতাদির? নিজস্ব বাড়িটুকু ছাড়া? সাহেব যে লাখ, দু' লাখ জোগাড় করবে, সে ভরসাও তো করা যায় না। সর্বস্ব খুইয়ে চিকিৎসা করিয়েও পরিণাম তো অবশ্যম্ভাবী!

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম সাহেবকে। বেজে গেল ফোন। রাতে করলাম, এবারও সাড়া নেই। সাহেব কি রাতে হাসপাতালেই আছে? নাকি টেলিফোন খারাপ? দুঃসময় তো একা আসে না, তখন একে একে সবই বিগড়োতে থাকে।

পরদিনই রবিবার ছিল। তাপস আর আমি ছুটলাম বিকেলে। হাসপাতালের লাউঞ্জে চেনাপরিচিত কাউকেই দেখতে পেলাম না। সাহেবকেও নয়। অগত্যা রিসেপশন কাউন্টার। জিজ্ঞেস করে হদিস মিলল কবিতাদির।

তাপস সরে আসছিল, পিছন থেকে কাউন্টারের মেয়েটি ডাকল,—শুনছেন? আপনারা কি এখন পেশেন্ট দেখতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কোনও অসুবিধা আছে?

—না, না একজন একটু আগে গেছেন। ওই যে গান করেন...পিয়ালি দাশগুপ্ত...

দু'জনেই জোর চমকেছি। পিয়ালি কবিতাদিকে দেখতে এসেছে? মেয়েটি আবার বলল,—ম্যাডামকে বলবেন, উনি বিল পেমেন্টের ক্রেডিট কার্ডটা ফেলে গেছেন। এসে যেন নিয়ে যান।

এবার চমক নয়, ধাক্কা। ভুলভাল শুনছি না তো?

ওপরে ওঠা পর্যন্ত আমাদের দুজনেরই মুখে কোনও কথা ফুটল না। আট শয্যার ছোট ওয়ার্ডটিতে ঢুকেই আমাদের দু জোড়া পা গেঁথে গেল মাটিতে। ফিডিং কাপে করে পিয়ালি কি যেন খাইয়ে দিচ্ছে কবিতাদিকে। পাশে সাহেব। সাহেবের কাঁধে ঝুলছে পিয়ালির ভ্যানিটিব্যাগ।

কী চমৎকার এক পারিবারিক দৃশ্য। সত্যিও বটে। আবার অলীকও বটে।

আমি আর তাপস মুখ চাওয়চাওয়ি করলাম। অস্ফুটে বলে উঠেছি,—কী বুঝছ?

তাপস দু দিকে মাথা নাড়ল,—হিসেব মেলে না। হিসেব মেলে না।

অচিন মায়া

মানিকের মা কাজে এলো না আজ। অপেক্ষা করে করে দশটা নাগাদ নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিল রঞ্জন। তাড়া অবশ্য নেই, রান্না আরো পরে চাপালেও চলে, কিন্তু ছুটির সকালে একা ফ্ল্যাটে সে এখন করবেই বা কী? টিভি দেখবে বসে বসে? একঘেয়ে, ভীষণ একঘেয়ে। বই পড়বে? ক্লান্তিকর। গান শুনবে? ইচ্ছে করছে না। গড়াগড়ি খাবে বিছানায়? তাও ভালো লাগছে না। আবার উলটোবে খবরের কাগজ? ধুৎ। তার চেয়ে বরং এই রান্না রান্না খেলাটা কি মন্দের ভালো নয়?

রঞ্জন একটা মেনু এঁচে নিল মনে মনে। মেন আইটেম ডিমের ঝোল আর ভাত। সঙ্গে মুগডাল আলুভর্তা। ডালে সম্বর দেওয়া নিয়ে অবশ্য একটু সমস্যা হয়। পনেরো বছর একা বাস করেও কায়দাটা এখনো পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। হয় জিরে বেশি পুড়ে যায়, নয় শুকনো লঙ্কা ভাজা হয় না ঠিক ঠিক। আর হলুদ-আদার আন্দাজ তো কখনোই নিখুঁত থাকে না। যাক গে যাক, সে নিজেই তো খাবে, আজ আর-একবার চেষ্টা চালানোই যায়।

ভাবতে ভাবতে হাত চলছে। রাতের থালাবাটিগুলো মেজে ফেলল রঞ্জন। সকালের চা-জলখাবারের কাপপ্লেটও। রান্নাঘরের ওয়াল ক্যাবিনেট খুলে জরিপ করল মশলাপাতির হাল। আছে। গুঁড়ো হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা, গরমমশলা, সবই মজুত। শুধু পেঁয়াজ আদা রসুন মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই হ্যাংগাম শেষ।

কড়াইতে ডিম-আলু সেদ্ধ বসিয়ে রঞ্জন পেঁয়াজ নিয়ে পড়ল। খোসা ছাড়াল মন দিয়ে। কুচোচ্ছে। ওফ্, কী ঝাঁঝ! বেদনার পরাকাষ্ঠা! হাতের পিঠে বারবার চোখ মুছছে রঞ্জন। নাক টানছে।

কলিংবেল বেজে উঠল। রঞ্জনের ভুরুতে কুঞ্চন। মানিকের মা নিশ্চয়ই আর এত বেলায় আসবে না। তবে কে? দীপংকর? ব্যাটা সল্টলেকে ফ্ল্যাট কেনার পর থেকে হানা দেয় মাঝেমধ্যে। গৌরবও হতে পারে। কিংবা আজিজুল। ব্যাচেলার বনে-যাওয়া বন্ধুর এই ফাঁকা ফ্ল্যাটের মতো তোফা আড্ডার ঠেক কটাই বা আছে! প্রাণের সুখে গুলতানি মারো, কাপের পর কাপ চা বানাও আর ওড়াও, কিংবা বোতল খুলে বসে পড়ো, এখানে তো তেমন কেউ নেই যে তোমায় ঠেলা মেরে ভাগাবে।

চিন্তাটায় যেন একটা চোরা বিষাদও আছে। ছোট্ট শ্বাস ফেলে দরজা খুলতে গেল রঞ্জন।

পাল্লা টেনেই রঞ্জন হতচকিত। চৌকাঠের ওপারে এক ঝকঝকে তরুণী। পরনে কালোর ওপর জংলা ছাপ লং-স্কার্ট। টুকটুকে লাল টপ, কাঁধে বাহারি ব্যাগ। মুখটা যেন খুব চেনা চেনা। কোথায় দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

প্রশ্ন করার আগে মেয়েটিই সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞেস করল, আপনিই নিশ্চয় রঞ্জন মজুমদার?

হতভম্ব রঞ্জন মাথা নাড়াল, হ্যাঁ...

—আমি মিমি। আই মিন মধুরিমা। আমার মায়ের নাম স্বাগতা। আশা করি এর বেশি পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই?

রঞ্জন পলকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। কী শুনল সে? ভুল নয় তো? মিমি...মিমি এসেছে তার কাছে? যে-মেয়েকে একটিবার দেখার জন্য একসময়ে সে মাথা খুঁড়েছে, হতাশ হয়ে হালও ছেড়ে দিয়েছে কবে যেন, সে আজ স্বয়ং রঞ্জনের দরজায় হাজির! এও কি সম্ভব? নাকি দিবাস্বপ্ন দেখছে রঞ্জন?

অস্ফুটে রঞ্জন বলল, ও...। এসো, ভেতরে এসো।

—সরি। এখানেই ঠিক আছে। আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছিলাম।

অবিকল সেই স্বাগতার গলা। বাচনভঙ্গিও হুবহু স্বাগতার। সেই গনগনে তেজ। সেই একই রকম কাঠিন্য।

রঞ্জনের বুকটা চিনচিন করে উঠল। তবু জোর করে হাসি ফোটাল ঠোঁটে। খানিকটা নাটুকে ভঙ্গিতেই বলে ফেলল, আমার দরজা থেকেই ফিরে যাবে তুমি? একবারটি ভেতরে পা রাখবে না?

প্রার্থনায় কি খুব বেশি আকুতি ছিল? মিমি যেন ক্ষণিক দোটানায়। স্থির চোখে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করল একটু। কব্জি উলটে ঘড়ি দেখল, বুঝি গড়ে নিল

ভাবনার সূক্ষ্ম অবকাশ। তারপর গুমগুমে গলায় বলল, অল রাইট। চলুন। তবে আমি বেশিক্ষণ বসব না।

—এসো তো।

দু-কামরার ফ্ল্যাটের ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসটুকু বড্ড অগোছালো হয়ে আছে আজ। বেতের সোফায় যেমন-তেমন ছড়ানো ইংরিজি-বাংলা খবরের কাগজ। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেঁড়া খাম, খালি সিগারেটের প্যাকেট। দু-দুখানা অ্যাশট্রে, দুটোই টইটুম্বুর। টিভির ওপর জলের বোতল। শোকেসের মাথায় ম্যাগাজিনের স্তূপ। ফাঁকা হুইস্কির বোতল শোভা পাচ্ছে টেলিফোনের পাশে। দেখে শিশুও বুঝবে এ এক ছন্নছাড়ার সংসার।

খবরের কাগজগুলো ঝটপট সরাতে গিয়ে রঞ্জনের খেয়াল হলো আনাজ কাটার ছুরিটাও হাতে ধরা আছে এখনো। মেয়েটাও যেন তেরচা চোখে দেখছে অস্ত্রখানা। অপ্রস্তুত স্বরে রঞ্জন বলল, পেঁয়াজ কাটছিলাম। রেখে আসতে ভুলে গেছি।

মিমি হাসল না। চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

খপ্ করে বোতলটা তুলে নিয়ে রঞ্জন ত্বরিত পায়ে রান্নাঘরে। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। বুকে খানিকটা বাতাস ভরে স্থিত করল নিজেকে। বোতল নামাল সিংকে, ছুরি যথাস্থানে। পায়ে পায়ে ফিরল ঘরে। সোফা ঝাড়ছে। মৃদুস্বরে বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।...জল খাবে?

— নো থ্যাংকস্।

মিমি বসেছে আড়ষ্টভাবে। দেওয়ালে রঞ্জনের কাঁধে আড়াই বছরের রিমি, সেদিকে ঝলক তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কপালে চওড়া চওড়া ভাঁজ ফেলে বলল, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন?

রঞ্জন যেন ঠিক শুনতে পেল না। মিমিকে দেখছে নিষ্পলক। কত বড় হয়ে গেছে তার মেয়েটা। সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফোলা ফোলা গাল, গাবলুগুবলু মিমির সঙ্গে এই মিমির মিল পাওয়া ভার। সামান্য লম্বাটে মুখ, সরু কপাল, পাতলা পাতলা নাক, ঈষৎ চাপা ঠোঁট, আয়ত চোখ আর কাঁধছোঁয়া চুলে শ্যামলারঙা মিমি এখন একেবারে অন্যরকম। কার মতোন হয়েছে মিমি? স্বাগতা? উঁহু, স্বাগতার মুখ তো গোল। রঙও অনেক ফর্সা স্বাগতার। বরং মিমির মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মায়ের আদলই মেলে বেশি। মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেলেও মেয়ের চেহারাটাকে মনমতো বদলাতে পারেনি স্বাগতা, যাদের সে অসম্ভব অপছন্দ করত তাদেরই একজন রয়ে গেল মিমির অবয়বে।

মিমির কপালের ভাঁজ ক্রমশ ঘনতর। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, আমি কিন্তু কোনো সারপ্রাইজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি। ইন্‌ফ্যাক্ট, আমার মা-ও জানে না...জানলে অবশ্য আমার আসাটা অ্যালাও করত না।

রঞ্জনের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, তাহলে এলে কেন?

—ওই যে বললাম...একটা ইম্পরট্যান্ট কাজে। আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল।

—কী বলো তো?

—আপনি একসময়ে একটা ইনসিওরেন্স করিয়েছিলেন। আমার নামে। আঠারো বছরের পলিসি। মিমি এতক্ষণে সরাসরি তাকিয়েছে,—মনে পড়ে কি?

মিমি কোনদিকে কথা ঠেলতে চাইছে বুঝতে পারছিল না রঞ্জন। সত্যি বলতে কী, এখনো তার বোধবুদ্ধি সেভাবে ক্রিয়া করছে না। মিমির আকস্মিক উপস্থিতিতে এখনো যেন ধাতস্থ হয়নি মগজ। ফ্যালফ্যাল চোখে বলল, হ্যাঁ, একটা করিয়েছিলাম বটে। আমার মেয়ে যাতে বড় হয়ে লাম্পসাম একটা অ্যামাউন্ট পায়...কিংবা...।

—পলিসিটা ম্যাচিওর করেছে।

—বাহ্‌, ভালো তো।

—না, ভালো নয়। ও টাকা আমার চাই না।

বাক্যটা এমন তীক্ষ্ণভাবে ছুঁড়ল মিমি, ক্ষণিকের জন্য রঞ্জন যেন শরাহত। অতিকষ্টে হজম করল আঘাতটা। জিজ্ঞেস করল, কেন নেবে না, জানতে পারি কি?

—কেন নেব তার কোনো আন্‌সার আপনার কাছে আছে কি?

নাহ্‌, এ মেয়ে রঞ্জনকে ক্ষতবিক্ষত করতেই এসেছে আজ। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলল রঞ্জন। ধরিয়েও ফেলল একটা ফস্‌ করে। টের পেল জ্বলন্ত সিগারেট আঙুলের ফাঁকে কাঁপছে টিপটিপ। একটা ক্রোধও যেন কোত্থেকে ধেয়ে আসে মস্তিষ্কে। স্বাগতা শুধু মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যত্ন করে তাকে শিখিয়েছে, কীভাবে রঞ্জনকে অবজ্ঞা করতে হয়। অবজ্ঞা? না ঘৃণা?

চোখের কোণ দিয়ে রঞ্জনকে দেখছে মিমি। বোধহয় তূণ হাতড়াচ্ছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে আবার কোনো তীর হানার। মাথায় একরাশ ধোঁয়া পাঠিয়ে রঞ্জন খানিকটা লাগামে আনল নিজেকে। গোছালো। তবু ঝাঁঝ একটু এসেই গেল গলায়, আমার কাছে অনেক উত্তরই আছে মিমি। তুমি কি সেগুলো শুনতে চাও?

মিমি ঘাড় ফেরাল দেওয়ালের দিকে। কঠিন চোয়ালে উপেক্ষা।

রঞ্জন মরিয়াভাবে বলল, কোয়েশ্চেন করলে রিপ্লাইয়ের জন্যও তৈরি থাকতে হয় মিমি। নইলে কিন্তু যাকে প্রশ্ন করছ তার প্রতি অবিচার করা হয়।

মিমি তবু নীরব। ঠোঁট কামড়াচ্ছে। বিরক্তি চাপছে কি?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নেবাল রঞ্জন। চেপে চেপে। নাহ্, সে বোধহয় একটু বেশিই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে। পনেরো বছর পর মেয়েকে আচমকা সামনে পেয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য ছটফট করাটা কি ছেলেমানুষি নয়? আর সে বলবেই বা কী? স্বাগতার সঙ্গে কেন তার সম্পর্ক বিষিয়ে গিয়েছিল? কেন তারা পরস্পরকে দুটো বুনো জন্তুর মতো আঁচড়েছে কামড়েছে? সে তো তার আর স্বাগতার ব্যাপার, মেয়েকে ওসব শোনাবে কেন? স্বাগতা যদি মেয়ের কানে বিষ ঢেলেও থাকে, তিন লাইন কৈফিয়ত গেয়ে সেই বিষ কি নামাতে পারবে রঞ্জন? ডিভোর্সের পর সে যে কতবার মেয়ের যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, এমনকী স্বাগতা ফের বিয়ে করার পরও, বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে, এসব কথাই বা আজ মিমিকে বলে কি এমন মোক্ষলাভ হবে? মেয়ে যে তার প্রতি কতটা বিরূপ, সে তো তার অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট, ফালতু ফালতু সাফাই গেয়ে কেন মুখ নষ্ট করবে রঞ্জন? বরং মেয়ে যে এত বছর পর তার কাছে এলো, এই সুখটুকুকেই তো সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে এখন। বাদানুবাদে না গিয়ে।

রঞ্জন সোজা হয়ে বসল। গলা ঝেড়ে বলল, ওকে। ইট্স অল্রাইট।...কিন্তু তুমি যে টাকাটা নেবে না, তোমার মা জানে তো?

—জেনে যাবে।

—ও।...এখনো মাকে বলোনি তাহলে?

—দ্যাট্স নান্ অফ্ ইওর বিজনেস্। ইট্স বিটুইন আমি আর মা। আমি না চাইলে মা কক্ষনো ওই টাকা নিতে আমাকে ফোর্স করবে না।

রঞ্জন মনে মনে বলল, বটেই তো। রঞ্জনের মুখে আর-এক পোঁচ কালি বোলানোর সুযোগ স্বাগতা থোড়াই ছাড়বে। হয়তো মেয়ের পিঠ চাপড়ে বলবে, বহুত আচ্ছা। অসভ্য দায়িত্বজ্ঞানহীন বদমাইশটার মুখের ওপর পলিসিটা ছুঁড়ে মেরে আয়।

তা এসব ভাবনা অবশ্য রঞ্জনকে সেভাবে বিচলিত করে না আজকাল। ধুস্, কষ্ট পাওয়ার সেই কুৎসিত ধাপগুলো তো সে কবেই পেরিয়ে এসেছে। এখন তো সে প্রায় গণ্ডারেরই সগোত্র। তাও আবার শিংভাঙা।

ম্লান হেসে রঞ্জন বলল, ঠিক আছে। এতই যখন আপত্তি, নিও না টাকা। আমার তো তোমার ওপর কোনো জোর নেই।

—নেইই তো। মিমির স্বর রুক্ষতর, আমারও আপনার ওপর কোনো জোর নেই। আর নেই বলেই ও টাকা টাচ্ করা আমার উচিত হবে না।

—ব্যস ব্যস ব্যাস, ম্যাটার ইজ সেটলড্। দুহাত তুলে মিমিকে থামাল রঞ্জন। অনুনয়ের সুরে বলল, এবার একটু রিল্যাক্স করো। বলো কী নেবে? চা? না কফি? আমি কিন্তু দুটোই ভালো বানাই।

—সরি। আমি এখানে আপ্যায়িত হতে আসিনি।

—আহা, উত্তেজিত হচ্ছো কেন? বি লজিক্যাল। রঞ্জন মাথাটাকে একদম বরফ করে ফেলল। মিমির বুনো ঘোড়ার মতো হাবভাব দেখে এবার যেন একটু মজাই লাগছে তার। হাসি হাসি মুখে বলল, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো না, আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?

—করি না-ই তো।

—অর্থাৎ আমরা পরস্পরের অনাত্মীয়। রাইট?

—অবশ্যই।

—আমরা কি পরস্পরের শত্রু? তাও তো নয়। ঠিক?

মিমি থতমত। চোখ পিটপিট করছে।

—তাহলে কী দাঁড়াল? অনাত্মীয় এবং শত্রু নয় এমন একজন আমার বাড়ি এসেছে। সে তাহলে আমার গেস্ট। অতিথিকে আপ্যায়ন করা কি গৃহস্বামীর কর্তব্য নয়? অন্তত প্রথম দিন?

মিমি চোখ কুঁচকে তাকিয়ে। বুঝি-বা পড়তে চাইছে রঞ্জনকে। দেখতে দেখতে নাক কুঁচকে গেল হঠাৎ। জোরে জোরে শ্বাস টানছে। বিড়বিড় করে বলল, কিসের একটা পোড়া গন্ধ আসছে না?

—হ্যাঁ, তাই তো। রঞ্জনও চমকেছে—গ্যাসে ডিম-আলু বসিয়েছিলাম। গেল বোধহয়।

বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। যা ভেবেছে তাই, জল ফুটে মরে গেছে কখন, শুকনো কড়া পুড়ছে চড়চড়। তাদের বাপ-মেয়ের সম্পর্কের মতো। আপনমনে হাসল রঞ্জন। ঝটিতি নেভাল গ্যাস। সাঁড়াশি বাগিয়ে ধরে কড়া নামাল সিংকে। দীর্ঘশ্বাস চেপে ফিরছিল ড্রয়িংস্পেসে, থমকাল হঠাৎ।

মিমি সোফায় নেই।

মিমি দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে!

মিমি গভীর মনোযোগে দেখছে টাঙানো ছবিটা।

কিছু কি মনে পড়ছে মিমির? শৈশবের কোনো স্মৃতি? একটু কি মেদুর হলো মিমির মন?

রঞ্জন গলা খাঁকারি দিল, ছবিটা এখানেই তোলা। তোমার বড়মামার ক্যামেরায়। এই ফ্ল্যাটটা তখন সদ্য কেনা হয়েছে।

বিদ্যুৎলতার মতো সোফায় ফিরে গেল মিমি। যেন রঞ্জনের কথাগুলো কানেই যায়নি এমন একটা ভান করে বলল, আপনার ডিম-আলুর কী খবর? অবশিষ্ট আছে কিছু?

—নাহ্ জ্বলে-পুড়ে খাক।

—মা আপনার সম্পর্কে ঠিকই বলে।

—কী বলে?

—সে আপনি শুনে কী করবেন?

—কী বলে আমি জানি। আমি সংসার করার অযোগ্য। তাই তো?

—ভুল বলে কি? মিমি টেরিয়ে তাকাল, রোজ কি এরকমই রান্নাবান্না হয়?

মেয়ের সামনে নিজেকে একজন দুঃখী-অসহায় মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে বাধছিল রঞ্জনের। তাছাড়া সে তো এখন সত্যিই তেমন একটা খারাপ নেই, বরং এ ধরনের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মিছিমিছি বাচ্চা মেয়েটার সহানুভূতি কাড়ার অপচেষ্টা সে করবেই বা কেন!

রঞ্জন শব্দ করে হেসে উঠল, রোজ এরকম হাল হলে কবেই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যেতাম। আমার রাঁধার সময় কোথায়! লোক একজন আছে, সে যা বানিয়ে দেয় তাই সোনামুখ করে খেয়ে নিই। সে ডুব মারলে তবেই এই আপনা হাত জগন্নাথ।

—আজ তো রান্নার বারোটা। আজ কী হবে?

—ইচ্ছে হলে আবার বসাব। কিংবা মুড়ি চিবোবো। অথবা টোস্ট-ওমলেট। বাইরে থেকেও খেয়ে আসতে পারি। ফোন করে খাবার আনিয়েও নেওয়া যায়। আর কোনোকিছুরই মুড না থাকলে এ বেলা স্রেফ হরিমটর।

—বুঝলাম। মিমি একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর ঔদাসীন্যের প্রলেপমাখা গলায় বলল, তা এরকম একা একা থাকার দরকারটা কী?

—এই বয়সে দোকা জোটাব কোত্থেকে? জানো, নেক্সট ফেব্রুয়ারিতে আমি হাফ সেঞ্চুরি করব?

—অনেক আগেই তো বন্দোবস্তটা করতে পারতেন।

—তা হয়ত পারতাম। রঞ্জনের মুখে একটা ছদ্ম-করুণ ভাব এবার, কিন্তু একজনের জন্য প্রতীক্ষা করে ছিলাম যে।

মিমির চোখ সরু, কে সে?

রঞ্জন মনে মনে বলল, তুই তুই তুই।

মুখের রহস্যের হাসি টেনে বলল, এতটা পারসোনাল কথা তোমায় বলে ফেলব, এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

—সরি। মিমি পলকে গোমড়া। চোয়াল শক্ত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, আমার জানারও প্রয়োজন নেই।

—কী কাণ্ড, চটে গেলে কেন? মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি দেখে রঞ্জনের চোখ চিকচিক। নরম গলায় বলল, কুল। কুল। ফ্রিজে একটা কোল্ডড্রিংক্স আছে, দেবো?

মিমির জবাবের অপেক্ষায় না থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের ঢাউস বোতলখানা বের করে আনল রঞ্জন। দুখানা গ্লাসও। তরল ঢেলে একটা গ্লাস মিমিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, চুমুক দাও।

গ্লাসটা ধরল মিমি, তবে খাচ্ছে না, ভাবছে কী যেন।

রঞ্জন মেয়ের মুখোমুখি বসল, এবার আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—কী?

—তুমি তো বললে মাকে জানিয়ে আসোনি, তাহলে এ বাড়ির ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?

—পেয়েছি। যেখান থেকে হোক।

—তবু শুনি।

মিমি ঠোঁট বেঁকাল, আপনাকে এতসব কথা বলব এমন ঘনিষ্ঠতা আমাদের হয়েছে কি?

রঞ্জন হেসে ফেলল। চোখ চোখ নাচিয়ে বলল, আমি অবশ্য সোর্সটা আন্দাজ করতে পারছি। বীমার পলিসিতে এ বাড়িরই অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল।

মিমি গোঁজ। ছোট্ট করে চুমুক দিল কোল্ডড্রিংক্সে। বুঝি-বা অস্বস্তি গোপন করতে।

—এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। রঞ্জনের হাসি চওড়া হলো, পলিসিটা ছিল তোমার মা-র জিম্মায়। সামহাউ তুমি সেটি দেখে ম্যাচিওরিটির ডেট্টা জানতে পেরেছ। কিন্তু ইনশিওরেন্স কোম্পানি তো টাকা-পয়সা সংক্রান্ত চিঠি এ বাড়ির

ঠিকানাতেই পাঠাবে, সেই চিঠি পেয়ে আমি তোমার মা-র কাছ থেকে অরিজিনাল পলিসিটা চাইব, বীমা অফিসে জমা করব, তারপর চেক আসবে, তারও পরে তোমার টাকা পাওয়ার প্রশ্ন। এবং তার যথেষ্ট দেরি আছে।...তুমি সাত তাড়াতাড়ি নেব না নেব না করে ওপরপড়া হয়ে ছুটে এসেছ কেন?

মিমি দু-এক সেকেণ্ড চুপ। তারপর গলায় ভারিক্কি ভাব এনেছে,—আমি পরে কোনো এম্‌ব্যারাসিং সিচুয়েশনে পড়তে চাই না।

—হুম।...তা পলিসিটা একেবারে হাতে করে নিয়ে চলে এলেই তো পারতে।

—পরে পোস্টে পাঠিয়ে দেবো। কিংবা কুরিয়ারে। আজ ডিসিশনটা জানিয়ে গেলাম।

—ও।... কিন্তু আমার একটা খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল যে।

—কিসের খুঁতখুঁতুনি?

—পলিসিটা আমি করেছিলাম আমার দুবছরের মেয়ের নামে। আমার ছোট্ট রিমিকে ওটা উপহার দিয়েছিলাম। গিফ্‌ট ফেরত নেব?

—সে আপনার ব্যাপার। মিমির গলা যেন দুলে গেল সহসা। পরক্ষণে ঠোঁট কামড়েছে, ইচ্ছে হলে টাকাটা কোনো অনাথাশ্রমেও দান করে দিতে পারেন।

—সে তো মিমি নিজেও দিতে পারে।

—সরি। আপনার টাকায় নাম কেনার বাসনা মিমির নেই।

কী অবলীলায় বাবাকে অপমান করে চলেছে মেয়ে। রঞ্জনের বুকের মধ্য দিয়ে শুকনো বাতাস বহে গেল। দুলে উঠছে পুরনো পুরনো ছবি। স্বাগতার বাপের বাড়িতে মিমিকে ফোন করেছে রঞ্জন, তোতাপাখির মতো মিমি দুরভাষে আওড়াচ্ছে, তুমি দুষ্টু, তুমি খারাপ, তুমি কক্ষনো আমায় ফোন করবে না...। মেয়েকে চোখের দেখা দেখতে স্বাগতার বাড়ি ছুটে গেছে রঞ্জন, দরজা খুলে স্বাগতা রক্তচক্ষু, ফের তুমি জ্বালাতে এসেছ? ডাকব মেয়েকে, শুনবে সে তোমার কাছে যেতে চায় কিনা...! মায়ের হাত চেপে আছে মিমি, কটকট বলছে, তুমি পচা, তুমি ভালো নও, একদম আমার কাছে আসবে না...। কোর্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারপরও হয়তো জোর করে মেয়েকে দেখতে চাইতে পারত রঞ্জন, কিন্তু কাকে দেখবে সে? স্বাগতা আবার বিয়ে করার পর অনেকে বলেছিল, এবার তুই কোর্ট থেকে মেয়ের কাস্টডি চেয়ে নে। রঞ্জনের সাহসে কুলোয়নি। মেয়ে যদি আবার মুখের ওপর না বলে দেয়! আবার শেখানো বুলি উগরে

দেয়।

এখনো কি শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে মিমি? মনে হয় না। ছোটবেলা থেকে কোনো ধারণা মগজে গেঁথে দিতে পারলে তা ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হয়। স্বাগতা সফল। মেয়ে এখন সত্যিই মন থেকে ঘৃণা করে বাবাকে।

শুকনো বাতাসকে ঠেলে সরিয়ে একরাশ জলভরা মেঘ ঢুকে পড়ল বুকে। হায় রে, মিমি তো রঞ্জনকে বাবা বলে মানেই না। লোকমুখে রঞ্জন শুনেছে স্বাগতার বরকে বাপি বলে ডাকে মিমি। এই সংসারে মিমি এখন পুরোপুরি থিতু, রঞ্জন তার কাছে এক অস্বস্তিকর অস্তিত্ব মাত্র।

ভেতরের সাইক্লোনটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বাগে আনল রঞ্জন। গলা ঝেড়ে বলল, ঠিক হ্যায়। সে একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন। এবার তোমার কথা একটু বলো।

খালি গ্লাস নামিয়ে রাখল মিমি, আমার আবার কী কথা?

—তুমি তো বি এসসি পার্ট ওয়ান দিয়েছ, তাই না? বটানি অনার্স?

—অনেক খবর রাখেন তো!

—কানে এসে যায়। বি এস সির পর কী ইচ্ছে? এম এসসি করবে তো?

—হয়তো।

—তারপর রিসার্চ? অ্যাকাডেমিক লাইনেই থাকতে চাও?

—ঠিক নেই। রেজাল্টের ওপর ডিপেন্ড করছে। বলেই মিমি সচকিত, আপনি জেনে কী করবেন?

—এমনিই। জাস্ট কৌতূহল।

—মিনিংলেস কিউরিসিটি। বলেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি, থ্যাংক্স ফর দ্য কোল্ডড্রিংক্স। ঘরে ডাকার জন্যও ধন্যবাদ। চলি।

—চলি বলতে নেই মিমি। বলো আসি।

মিমি ঘাড় কাত করে শুনল কথাটা। তারপর পায়ে পায়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে।

রঞ্জনের বুকটা হুহু করে উঠল। পেছন থেকে ডেকে উঠেছে, মিমি?

—কিছু বলবেন?

—একটা রিকোয়েস্ট করব? রঞ্জনের গলা কেঁপে গেল, রাখবে?

—কী?

—পলিসিটা পোস্ট-ফোস্টে নয় না-ই পাঠালে। কোথায় কীভাবে হারিয়ে যায়...। তুমিই কুরিয়ার হয়ে এসে দিয়ে যেও।

মিমি চোখে চোখ রাখলো, তাকিয়েই আছে। রঞ্জনের চোখে কী খোঁজে মিমি? কিছু কি পেল দেখতে?

রঞ্জন ফের বলল, আসবে তো?

উত্তর না দিয়ে মিমি দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে। নামছে। এক পা এক পা করে।

রঞ্জন দ্রুত বেরিয়ে রেলিং ধরে ঝুঁকল। দেখছে মেয়ের চলে যাওয়া। হঠাৎই রঞ্জন বিমূঢ়। দেড়তলার ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মিমি। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে রুমাল বের করল। মুখ নয়, ঘাম নয়, চোখ মুছছে। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের ইশারায় ঝট্ করে একবার তাকাল ওপরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে নেমে গেল বাকি সিঁড়িটুকু।

রঞ্জনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছিল। ইস্, নিজের মেয়েকে বুঝতে এতটা সময় লেগে গেল!

জাহাজবাড়ির পরী

গোলাপি আসছে না দেখে নিজেই সকালের চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়েছিলাম। সবে পাতা ভিজিয়েছি, ডোরবেলের সুরেলা ঝংকার।

যাক ডুব মারেনি তাহলে।

অপ্রসন্ন মুখে বললাম,—তুই যে কী হচ্ছিস দিন দিন!

বকুনিটা গোলাপি গায়েই মাখল না। চোখ ঘুরিয়ে বলল—কী কাণ্ড গো বউদি, কী কাণ্ড! শুনেছ কী হয়েছে?

বাহানা বানাচ্ছে! দেরি করে এলেই মেয়েটা আজব আজব গপ্‌পো ফাঁদে। গলা রুক্ষ করে বললাম,—কী হয়েছে? ঢাকুরিয়া স্টেশনে কোনো পাগল সার্কাস দেখাচ্ছে? নাকি মাতাল গড়াগড়ি খাচ্ছে? আর তাই দেখতে গিয়ে তোর...?

—না গো, না। গোলাপি সুড়ুৎ করে ফ্ল্যাটের অন্দরে সেঁধিয়ে এলো,—এই মোড়ের মাথায় আজ জোর জটলা গো। জাহাজবাড়ির পরীদিদি নাকি কাল পালিয়েছে।

—যাহ্, কী আবোল-তাবোল বকছিস?

—মা কালীর দিব্যি। কাল বিকেলে দাসপাড়া বাজারে নাকি শব্‌জি কিনতে গেছিল, তারপর থেকে তার আর টেরেশ নেই।

আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি!

পরীরা থাকে আমাদের মোড়ের হলুদ বাড়িটায়। পরীর বাবা ছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, সেই সুবাদেই কী করে যেন নামটা চালু হয়ে গেছে এলাকায়। দোতলা বাড়িখানায় বিন্দুমাত্র জাহাজের আদল নেই, তবুও। ক্যাপ্টেন সাহেব বহুকাল আগেই পরপারে, তাঁর স্ত্রীও গত হয়েছেন বছরছয়েক, ও বাড়ি এখন পুত্র-কন্যাদের অধিকারে। বড় ভাই, ছোট ভাই বিয়ে করে সংসারী হয়েছে,

মেজটি এখনো ধর্মের ষাঁড়। আর পরীর তো বিয়ের প্রশ্নই নেই। লেখাপড়া করেনি, দেখতেও তেমন সুবিধের নয়, মেঘে মেঘে বয়সও গড়িয়েছে বেশ। না হোক পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ তো হবেই। যথেষ্ট মুটিয়েওছে ইদানীং। তবে পরী ভারি মিশুকে টাইপ। এ-পাড়ায় আমরা এসেছি প্রায় বছরপাঁচেক, আমার সঙ্গে ভাবও হয়ে গেছে দিব্যি। প্রচুর বকবক করতে পারে মেয়েটা। বাড়িতেও চলে আসে হুটহাট, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ঘোঁট শুনিয়ে যায়। নিজের বাড়িরও। একেবারেই সাদামাটা রহস্যহীন একটা মেয়ে। একটু-বা মাটোও।

সেই পরী কিনা আচমকা অন্তর্হিত? কেন?

প্রশ্নটা জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, গিলে নিলাম। গোলাপির সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনার কী দরকার! ঝি-চাকররা বাবুদের বাড়ির কেচ্ছা-কেলেংকারির গন্ধে ভারি আমোদিত হয়।

স্বভাবতই গোলাপিও রসে ফুটছে। আচার চাটার মতো করে বলল,—পরীদিদির মেজ ভাইটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী গাল পাড়ছে গো! বলছে, বজ্জাত মেয়েছেলে...আমাদের এভাবে আতান্তরে ফেলার কোনো মানে হয়? ফিরুক একবার হারামজাদি, মেরে যদি পাট পাট না-করি তো আমি এক বাপের ব্যাটা নই।

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল,—মেজ মানে ওই গাঁট্টাগোঁট্টাটা? চুলের কদমছাঁট?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই অলম্বুশটা। লাট্টু। যে চিটিংবাজি করে বেড়ায়।

গোলাপি ভুল বলেনি। পাড়ায় ছেলেটার খুব বদনাম। একে ওকে তাকে টুপি পরানোই নাকি লাট্টুর পেশা। কাউকে জমি কিনিয়ে দেওয়ার নাম করে করপোরেশনের মাঠ দেখিয়ে নোট হাতাচ্ছে, তো কাউকে চাকরির টোপ দিয়ে তার পকেট হাল্‌কা করছে। এই তো, একমাসও হয়নি, রাত এগারোটায় জাহাজবাড়ির সামনে কী হল্লাগুল্লা! চ্যাঁচামেচি শুনে সুপ্রকাশও বেরিয়ে গেল দেখতে। ফিরে এসে বলল, সেই পুরনো কিস্‌সা। ফোরটোয়েন্টি কেস। কাকে নাকি কোনো এক গ্যারেজের টয়োটা কোয়ালিস দেখিয়ে মাত্র সত্তর হাজারে পাইয়ে দেবে বলে আগাম দশ হাজার ঝেঁপেছিল। বারকয়েক চরকি খেয়ে লোকটা এবার চড়াও হয়েছে সদলবলে। তড়পাচ্ছে জোর। তবে কথায় আছে না, চোরের মায়ের বড় গলা! লাট্টু কুমারও খিস্তির বান ডাকাচ্ছে সমান তালে। দু'কান কাটা আর কাকে বলে।

তা এহেন গুণনিধি দাদাটি এখন বোনের ওপর গার্জেনি ফলাচ্ছে প্রকাশ্যে?

বলব না, বলব না করেও বলে ফেললাম,—গলা ফাটিয়ে কী হবে? বোনের খোঁজখবর করছে কোনো? হয়তো কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেছে।

—হাসালে বউদি। বেরোল বাজারের থলি নিয়ে, আর চলে গেল কুটুমবাড়ি?

—মনে কোনো রাগ-দুঃখ থাকলে যেতেই তো পারে। হয়তো ভাই, ভাইয়ের বউদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল!

—ঝগড়া তো জাহাজবাড়ির রোজকার ভজনকীর্তন গো বউদি। তাতে কি আর পরীদিদির গায়ে ফোসকা পড়বে?

—আরো কত কিছুই তো হতে পারে। কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাক্সিডেন্ট!

—দাসপাড়া বাজার এখান থেকে ক পা, গো? অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেউ একটা খবর পেত না?

—তাহলে আর কি! উবে গেছে। যা, চা-টা ছেঁকে ফ্যাল।

বললাম বটে, তবু ভাবনাটা যেন লেপটে গেল মাথায়। পায়ে পায়ে সোফায় এসে বসলাম। সুপ্রকাশও উঠে পড়েছে, সেন্টার টেবিলে ঠ্যাং তুলে সে এখন খবরের কাগজে মগ্ন। প্রথমেই শেয়ারের পাতাটা খোলে সুপ্রকাশ, সম্প্রতি কিছু টাকা রেখেছে মিউচুয়াল ফাণ্ডে, বাসিমুখে দেখে নেয় দর উঠল না পড়ল। আজ বোধহয় বাজার চড়েছে, সুপ্রকাশের মুখ বেশ আলোকিত। গোলাপি চা রেখে যাওয়া মাত্র চোখ থেকে নামাল কাগজ, ঠোঁটে কাপ ছোঁয়াচ্ছে আয়েশি মেজাজে।

সমাচারটা শোনানোর জন্য আমার পেট ফুলছিল। চায়ে একটা চুমুক দিয়েই বললাম, —এই জানো, পরীকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

—কোন পরী? ভিক্টোরিয়ার?

—আরে না। আমাদের পাড়ার। জাহাজবাড়ির পরী।

—অ। সেই লেংড়িটা?

—আহা, ওভাবে বলছ কেন! বেচারার পায়ের তলায় কড়া পড়ে গেছে, তাই একটু টেনে টেনে হাঁটে।

—নাকি ওইভাবে হাঁটে বলেই পায়ের তলায় কড়া পড়েছে?

—বাজে বোকো না তো। কথাটা শোনো। কাল সন্ধে থেকে পরীর আর খোঁজ নেই। বাজার করতে গিয়ে আর ফেরেনি।

—বাঁচা গেছে। অনেককাল আগেই ওর উড়ে যাওয়া উচিত ছিল। যা একখানা ফ্যামিলি, বাপ্‌স! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়! মেজটির তো

বোধহয় ইন্টারপোলে নাম উঠে গেছে। বড়টি একটি চালবাজ নাম্বার ওয়ান। আর ছোটটি তো রীতিমতো মিস্টিরিয়াস। আজ শুনি স্টোনের ব্যবসা করছে, তো কাল টয়ের! এই দিল্লি ছুটছে, এই মুম্বাই! আদৌ কিছু করে কিনা, করলেও কী করে, কোন পথে করে, সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটাই গুণ, ছোটটা বড়টার মতো বারফাট্টাই মারে না।

—হ্যাঁ, ছক্কার ব্যবহার ট্যবহার বেশ ভালো।

—ব্যবহার তো বড়রও ভালো। কী যেন নাম...ভেকু। ভেকু একদিন আমাকে বলেছিল, ও নাকি একসময়ে রেসিং কার চালাত! কার র‍্যালির নেশা ছিল! এখন সেই মিস্টার ভেকু বাবুবাগানের এক বুড়ো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের লঝঝরে ফিয়েট চালায়!

—আহা, বিয়ে থা করেছে, যা হোক করে কিছু রোজগারপাতি তো করতে হবে। কলেজটাও তো ডিঙোতে পারেনি।

—কিন্তু ঢপবাজিতে তো পি এইচ ডি। বাকতাল্লার বহর শুনবে? সেদিন ব্যাটা ফিয়াটের ড্রাইভিং সিটে বসে কায়দা করে খইনি পিটছে...আমি দেখে জাস্ট একটু হেসেছি...অমনি একটা ডায়ালগ ছেড়ে দিল। শরীর ব্লু ব্লাড বইছে তো দাদা, তাই বনেদি গাড়ি ছাড়া চালিয়ে সুখ পাই না! এ-গাড়ি দেখতে যেমনই হোক, খাঁটি ইটালিয়ান! সিক্সটি টুতে লোকার্নো র‍্যালিতে পার্টিসিপেট করেছিল!

—ওরা কিন্তু সত্যিই বনেদি বংশ। আদিসপ্তগ্রামের সান্যাল। বিখ্যাত পণ্ডিত হিরিশ মৈত্র নাকি ওদের মা-র সম্পর্কে মামা হন। শিশির ভাদুড়িও যেন ওদের কী রকম একটা দাদু।

—কে তোমায় এসব গপ্পো মারে, অ্যাঁ?

—পরীর মুখেই শুনেছি। ওদের নাকি এমন হীনদশা আগে ছিল না। পুরো সাহেবি কেতায় নাকি বড় হয়েছে পরীরা। দ্যাখো না, কেমন ইংরিজি বলে ফটর ফটর। ওর মা ছিলেন আর্মি অফিসারের মেয়ে। খুবই এটিকেট দুরস্ত। টেবিল ম্যানার্স থেকে শুরু করে প্রতিটি আদবকায়দা নাকি শিখিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের। নিজে এককালে ঘোড়ায় চড়তেন, গাড়ি ড্রাইভ করে পরীদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। ভাইজ্যাগে ওদের ফ্ল্যাটটা নাকি ছিল ছবির মতো। জাহাজ থেকে রিটায়ার করার পর ওর বাবার মাথায় কী যে ভূত চাপল, কলকাতায় থিতু হওয়ার জন্যে পাগল হয়ে পড়লেন।

—জানি, জানি। সুপ্রকাশ হাত তুলে আমায় থামাল,—ওদের হিস্ট্রি এ পাড়ার সকলের জানা। ক্যাপ্টেন মশাই এখানে এসে বাড়ি বানালেন। একটা

মেরিন ট্রেনিং স্কুল খোলার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়ল, চিকিৎসা করতে করতে ফ্যামিলি পুরো ফৌত।...কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না...এতই যদি ঘ্যামা পরিবার, ছেলেমেয়েগুলো এমন অশিক্ষিত, কুলাঙ্গার হয় কী করে! ছক্কাটা বোধহয় কেঁদে ককিয়ে গ্র্যাজুয়েট, বাকিগুলো তো মনে হয় স্কুলও পেরোয়নি।

—পরী নাইন অব্দি পড়েছিল।

—এগোল না কেন?

—আহা, ফ্যামিলিতে অমন একটা বিপর্যয়...।

—ডোন্ট টক রাবিশ। ওর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় অনেক ফ্যামিলিকে পড়তে হয়, তার পরেও ছেলেমেয়েরা ঠিক লেখাপড়া শিখে দাঁড়িয়ে যায়। এই তো একটা আস্ত বাড়ি ছিল, ওটা বেচেই তো যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যেত। ছেলেগুলোই-বা ঢপবাজ চিটিংবাজ বনে গেল কেন?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কেন বলো?

—খোঁজো। কারণটা খোঁজো। দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং ইন দ্য ফ্যামিলি। মা নিশ্চয়ই লাই দিয়েছে ছেলেদের। অথবা কেয়ারলেস থেকেছে। মেয়ের ফিউচার নিয়েও তিনি সেভাবে ভাবেননি। কিংবা যেভাবে ভেবেছেন তার পরিণামেই পরীকে ওই অকালকুষ্মাণ্ড ভাইগুলোর সঙ্গে বাস করতে হচ্ছে। এখন হয়তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে মেয়েটা কোথাও ট্রেনের তলায় গলা দিতে গেল।

—ও কি অলক্ষুণে কথা! পরী মরবে কেন?

—মরলে বেঁচে যাবে। নইলে অনন্ত দাসীবৃত্তি ওর কপালে লেখা আছে। দেখেছ তো, ভাই, ভাইয়ের বউগুলো ওকে কী খাটান খাটায়। বাজারহাট, দোকানপাট, রান্নাবান্না, সব ওই মেয়ের ঘাড়ে। ছক্কার মেয়ের বেবিসিটিংও তো করতে হচ্ছে। ও যেন কেন অ্যাদ্দিন পালায়নি, তাই তো আমার মাথায় ঢোকে না। রাস্তায় বসে ভিক্ষে করলেও অনেক সুখে থাকবে।

কথাগুলো মানতে ইচ্ছে করছিল না, আবার প্রতিবাদও করতে পারছিলাম না। সুপ্রকাশ চলে গেল বাজারে। টুকিটাকি ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে পরীর কথাই ঘুরেফিরে আসছিল মনে। সত্যি তো, মেয়েটার বিয়ে থা দেয়নি কেন? পরী অবশ্য বলে, মা তার বিয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্বন্ধগুলো লাগেনি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? উঠেপড়ে লাগলে পরীর বিয়ে কি হত না? এখন নয় পরী বেঢপ বনে গেছে, চিরকাল নিশ্চয়ই এরকম ছিল না। গায়ের রং তো মোটামুটি

ফর্সা, বিশ বাইশ বছর বয়সে অবশ্যই খানিকটা লাবণ্যও ছিল। তবে কি পরীর মা চাননি পরীর বিয়ে হোক? খরচাপাতির কথা ভেবেই পিছিয়েছিলেন কি? নাকি মেয়ে চলে গেলে তাঁকে খিদমতগারি করার আর কেউ থাকবে না বলে গুটিয়ে থাকতেন? এক সময়কার বেয়ারা বাবুর্চি দাসদাসী নিয়ে বাস করা অভ্যস্ত জীবনে একজন সর্বক্ষণের পরিচারিকা হিসেবে মেয়েকে ব্যবহার করে যাওয়াটাই কি তাঁর বাসনা ছিল? ভাই দাদারাও হয়ত সেই কারণেই পরীকে ঝিয়ের বেশি কিছু ভাবতে পারে না। কিন্তু তাই-বা বলি কী করে? পরীর তো সংসারে ভালই দাপট। গাধার মতো খাটে বটে, আবার ভাই ভাইয়ের বউদের তো দাবড়ায়ও। পরীর মাকেও স্বার্থপর ভাবাটা বোধহয় ঠিক নয়। ভদ্রমহিলাকে আমি দেখিনি, পরীর মুখে শুনেছি বর মারা যাওয়ার পর থেকেই ভদ্রমহিলা নাকি সুগার পেশেন্ট। শেষের দিকে বাতের ব্যথাতেও নাকি কষ্ট পেতেন খুব। যুবতী বয়সে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিলেন, সেটাও নাকি পরে ভুগিয়েছে খুব। হয়তো-বা সেই কারণেই মেয়ের ওপর একটু বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ভ্যাগাবন্ড ছেলেরা মায়ের দেখভাল করবে, এ তো আর আশা করা যায় না। তাছাড়া পরীর সম্বন্ধগুলোও তো ভাল আসেনি। দোকানদার, পিওন, কোর্টের মুহুরি, কিংবা বউমরা আধবুড়ো স্কুলমাস্টার। এককালে যে-মহিলা হাইফাই সোসাইটিতে বিচরণ করেছেন, তিনি কী করে সজ্ঞানে ওই ধরনের পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দেন?

যাই হোক, পরীর চিন্তায় মনটা কেমন মেঘলা হয়ে রইল দিনভর। সুপ্রকাশ অফিস থেকে ফেরার পর রাতেও খানিক গবেষণা হলো। তারপর উত্তেজনাটা আস্তে আস্তে থিতিয়েও গেল। সংসারে হাজারও কাজ, লক্ষ ঝামেলা, তার মধ্যে পাড়ার এক অকিঞ্চিৎকর মেয়ের কথা কদ্দিনই-বা মাথায় থাকে!

তবে গোলাপির কল্যাণে পরী মুছল না পুরোপুরি। গোলাপির নিজস্ব একটা নিউজ নেটওয়ার্ক আছে, সেইসব সাংবাদিকের অন্তর্তদন্ত আচ্ছা আচ্ছা চ্যানেলকেও ঘোল খাইয়ে দিতে পারে। তাদের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে পাতালেও বাস করা অসম্ভব।

মাসতিনেক পরে গোলাপিই বোমশেল ছাড়ল। হঠাৎই একদিন এসে বলল,—ও বউদি, পরীদিদির হদিস মিলেছে গো।

—তাই নাকি? কোথায়?

—সোনারপুরে। বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে।

—কার সঙ্গে?

—একটা লোক। সে নাকি পথেঘাটে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায়।

—যাহ্, তার সঙ্গে পরীর ভাব হবে কী করে?

—এই দুনিয়ার কিছুই আজব নয় গো, বউদি। কার সঙ্গে কার কোথায় যে কখন মনের মিল হয়ে যায়, কে বলতে পারে! লোকটা নাকি দাসপাড়া বাজারে এসে মাঝে মাঝে ভেল্‌কি দেখাত। সেখানেই বুঝি চার চক্ষুর মিলন।

—তা পালালো কেন? বলেকয়েই তো যেতে পারত।

—হয়তো ভেবেছে ভাইরা আটকে দেবে। পরীদিদি না থাকলে তো জাহাজবাড়ি অচল। ওই তো, পরীদিদি পালিয়ে যাওয়ার পর দু-দুটো দিন ও বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি। বোনের শোকে নয় গো। তুই থুলি মুই থুলি করে। বড় বউ ভাবছে সে রান্না চাপালে পাকাপাকিভাবে তাকেই রাঁধুনি বনে যেতে হবে, ছোটবউও ভাবছে একবার হেঁশেলে ঢুকলে হেঁশেল বুঝি তার ঘাড়েই চাপল। ভেড়ুয়া বরদুটোও তাদের তালে তাল মেরে যাচ্ছে। আর মেজ তো অকম্মার ঢেঁকি, তার তো বউ ছেলেরও বালাই নেই...সে বসে বসে বগল বাজাচ্ছে, আর দোকান থেকে রুটিতড়কা এনে ওদের সামনে গপাগপ সাঁটাচ্ছে। শেষমেষ বড়য় ছোটয় মিটিং করে ঠিক হল, এক বউ সকালে ভাত রাঁধবে, অন্যজন রুটি সেঁকবে বিকেলের। তা রুটিতে তো খাটুনি বেশি, তাই এ হপ্তায় যে রুটি, পরের হপ্তায় সে ভাত। আর মেজ অম্বুলেশের ডিউটি শুধু সাবড়ে যাওয়া। খেতে না দিলে সে মেরেধরে কেড়েকুড়ে খেয়ে নেবে। শোনো না, আজকাল কী ক্যাঁচম্যাচ বাধে ও বাড়িতে?

তা বটে। কানে আসে মাঝে মাঝে। রাত বাড়লেই ভাইয়ে ভাইয়ে গানবাজনা শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে বউদের দোহারকি। তা সে তো আগেও চলতো। পরী থাকতেই। গোটা পাড়া নিঝুম হলে তবেই না জাহাজবাড়ি জেগে ওঠে!

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম,—তুৎ, ও বাড়ির পাঁচালি কে শুনতে চায়! পরীর কথা বল। সে এখন আছে কেমন?

—বর পেয়েছে, ঘর পেয়েছে, আমোদেই আছে নিশ্চয়ই।

—তা তুই তো থাকিস তালদিতে। তুই খবর পেলি কী করে?

—সোনারপুর মাড়িয়েই আসা-যাওয়া করতে হয় গো, বউদি। আমাদের ক্যানিংয়ের গাড়িতেও সোনারপুরের বাতাস ঢুকে পড়ে। দোক্তা খাওয়া দাঁত ছড়িয়ে হাসল গোলাপি। চোখ টিপে বলল,—সোনারপুর থেকে কত মেয়ে ঢাকুরেতে কাজ করতে আসে। কেউ একজন জানতে পারলে, গন্ধ ছড়িয়ে

পড়তে কতক্ষণ!

—পরীর ভাইরা খবর পেয়েছে?

—নিশ্চয়ই। বিমলা তো বলছিল লাট্টুকে নাকি দেখেছে সোনারপুরে। সে নাকি প্রায়ই পরীদিদির বাড়ি যায়।

—আশ্চর্য, পাড়ায় কেউ জানে না তো!

—চেপে রেখেছে। বিয়ে হোক আর যাই হোক, তোমাদের মতো ঘরে এটা কেচ্ছা তো বটে।

মনে মনে হাসলাম। ভেকু লাট্টু ছক্কারা তাদের ঘরের খবর যেন কত গোপন রাখে! ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জব্বর একখানা গুল ফাঁদতে পারছে না বলে কথাটা এখনো চাউর করেনি বোধহয়। যখন করবে, কমসমের ওপর দিয়ে যাবে না নির্ঘাত। হুডিনির বংশধর না বলুক, পরীর বরকে পি সি সরকারের ভাইপো ভাগ্নে না কিছু বানিয়ে দেয়।

যাক গে, পরীর একটা হিল্লে তো হল। মেয়েটার যা শিক্ষাদীক্ষা, রূপ, বয়স...রাস্তার ম্যাজিশিয়ানই-বা মন্দ কী! বেচারা এখন সুখে থাকলেই শান্তি।

ঐন্দ্রজালিক সুখ অবশ্য বেশিদিন সইল না পরীর। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হঠাৎ একদিন পরী ব্যাক। লটবহর নিয়ে নয়, পেটে একটা বাচ্চা নিয়ে। সুপ্রকাশই মোড়ের চায়ের দোকান থেকে নিয়ে এসেছিল বারতাটি। পরীর সেই ম্যাজিশিয়ান বর নাকি খেলা দেখাতে বনগাঁ না বসিরহাট কোথায় গিয়েছিল, তারপর থেকে সে নিজেই ভ্যানিশ। অপেক্ষা করে করে, করে করে, অগত্যা ফিরে এসেছে পরী।

শুনে তো আমার মাথায় হাত। বললাম,—সর্বনাশ, আবার ওই বাড়িতে? পরীর ভাইদের কী রিঅ্যাকশান?

—ভেকু আর লাট্টু তো মোড়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে ডুয়েট গাইছে। ভেকু বলছে, হারামির বাচ্চা, তুই সান্যালবাড়ির মর্ম বুঝলি না! জানিস, এখনো আদিসপ্তগ্রামের বাড়ির পুজোয় আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সাতশো লোকের পাত পড়ে! আর লাট্টু বলছে, আমার বোনের সঙ্গে বেইমানি আমি ছুটিয়ে দেবো! ও শালার দেখা পাই একবার...পেছনে গ্রেহাউণ্ড লেলিয়ে দেবো! ও শালাকে খুন করে যদি ফাঁসি না যাই, তো আমি সাতপুরুষের বেজন্মা!

সাতপুরুষের বেজন্মাটা কী, আমার বোধগম্য হলো না। আর সাতশো লোকের পাত পড়ার মতো চণ্ডীমণ্ডপটা কত বিশাল হতে পারে তাও কল্পনা করতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম বোনের এই অপমানে দাদারা অতিশয়

মর্মাহত। সঙ্গে সঙ্গে আশ্বস্ত হলাম, যাক জাহাজবাড়িতে পরীর আবার থাকা নিয়ে অন্তত সমস্যা হবে না।

দিনে পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎ পরী স্বয়ং এসে হাজির। দুপুরবেলা। সেই একই ভঙ্গিতে। দুলে দুলে। মুখে কোনো দুঃখের ছায়া নেই। বরং আগের মতোই একটা নির্বোধ হাসির টুকরো ঝুলে আছে।

ডাকলাম,—আয়, আয়। কদ্দিন পরে দেখছি, তোকে একটু ভাল করে দেখি।

একটু যেন লজ্জা পেল পরী। বলল,—দূর, আমাকে কী দেখার আছে!

—বা রে, তুই কত বদলে গেছিস! হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর...! বলতে বলতে ফোলা পেটটার দিকে আঙুল দেখালাম,—এটাও তো নতুন।

পরী হেসে বলল,—পেটটা বড্ড বেড়ে গেছে গো।

—ক'মাস চলছে?

—পাঁচ। পরশু থেকে হেভি নড়ছে।

শোওয়ার ঘরে নিয়ে এলাম পরীকে। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসল পরী, দু-পা ছড়িয়ে দিল সামনে। তিনতলায় উঠে হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

পরীকে একগ্লাস জল এনে দিয়ে আমিও বসেছি সামনে। জিজ্ঞেস করলাম,— তারপর বল...কী খবর তোর?

—শুনেছ তো। পরী হাত উলটোল,—পার্টি ভেগে গেছে।

পরীর কথা বলার ধরনধারণও বদলায়নি এতটুকু। হেসে ফেলে বললাম,—ও কী বলার ছিরি! নিজের বরের সম্পর্কে ওভাবে বলতে আছে নাকি?

—বর না ঘেঁচু। ও তো একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল।

—মানে?

—ওর তো আগেই বিয়ে হয়েছে। বউ বাচ্চা আছে। হৃদয়পুরে।

—বলিস কী রে? আগের বিয়ে লুকিয়ে...?

—না না, লুকোছাপার বিজনেস নেই। আমাকে আগেই বলে দিয়েছিল, দু'নম্বর হয়ে থাকতে হবে। হৃদয়পুরের বউও আমার কথা জানে।

—কী কাণ্ড! তার মানে জেনেশুনে তুই...?

—কী করব বউদি, উই ওয়্যার ইন লাভ।

—লাভটা হল কী করে? ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক দেখে?

—তুৎ, ও আবার ম্যাজিশিয়ান নাকি? জানে তো মাত্র ছখানা কার্ডগেম।

পামিং পাসিং। আসল কাজ তো ওর ব্যথা-বেদনার তেল বেচা। হাতের কয়েকটা কেরদানি দেখিয়ে কাস্টমার জড়ো করে। তবে আজকাল ওই ট্যাকটিস্ কলকাতায় বেশি চলছে না। রোজগারের ধান্দায় গ্রামেগঞ্জে ঘুরতে হয়।

—তার মানে জাদুকরও নয়? কী দেখে তাহলে লোকটাকে পছন্দ করেছিলি?

—খুব স্মার্ট গো। বিউটিফুল কথা বলে।

—তাতেই তুই গলে জল?...কাউকে কিছু না জানিয়ে...ঘরবাড়ি ছেড়ে...?

—বললে এরা আমায় যেতে দিত নাকি? আমি না থাকলে সান্যালগুষ্টিকে সামলাবে কে? বউ-দুটোকে কে গ্রিপে রাখবে? এসে তো দেখছি বাবুদের কী হাল! বড়দা আর ছক্কা পালা করে কুটনো কুটছে। হি-হি। বউদি হাঁকল, ভাতের ফ্যানটা গেলে দিয়ে যাও তো...অমনি রাজার ব্যাটা পড়িমরি করে হাঁড়ি উলটোতে ছুটল! বউয়ের হুকুমে ছক্কাবাবু উবু হয়ে বসে আটা মাখছে! কী সিন! হি-হি হি-হি।

—হাসিস না। থাম। তোর প্রাণে এখনো এত ফুর্তি? বর তোকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও?

—গেছে তো গেছে। দুঃখ পাওয়ার কী আছে!

—গেল কেন? তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

—না।...ওর শালাটা একটা সোয়াইন। ওর নামে কেস ঠুকে দিয়েছে। একসঙ্গে দুটো বিয়ে তো বেআইনি। তাও টাকাপয়সা দিয়ে ম্যানেজ করতে চেয়েছিল, হারামি শালাটা রাজি হল না।

—তবে যে তুই বললি, আগের বউয়ের মত ছিল?

—মত ছিল বলিনি তো। জানত। ব্যাকডেটেড উওম্যান, মন থেকে মানতে পারেনি। তা এবার যাওয়ার সময়ে আমায় হাজার টাকা হাতে দিয়ে বলে গেছিল, এক মাস অপেক্ষা কোরো। এর মধ্যে ফিরলাম তো ফিরলাম। নইলে আমার আর আসা হল না। আমিও আর ওয়েট করিনি। এ মাসের ভাড়াটা না দিয়েই কেটে এসেছি।

একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য পরিবেশন করছে পরী। আমি শিহরিত হচ্ছিলাম। থতমত মুখে জিজ্ঞেস করলাম,—তাহলে যে শুনছিলাম...তোর বর কোথায় যেন ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে...?

—ওটা আমার স্টোরি। দাদারা কাঁউমাউ করছিল... লোককে কী বলবে...! তাই আমি ওটা সাজিয়ে দিলাম। তোমরা কি ভাবছ আমায় দেখে ওরা শক্‌ড?

বুলশিট্। সকলে দুহাত তুলে নাচছে। বউরাও। ছক্কার বউ তো সঙ্গে সঙ্গে গুটলিকে আমার পায়ে লেলিয়ে দিল। সে ছুঁড়িও পিসি পিসি করে অস্থির। খুব ওস্তাদ হয়েছে কিন্তু গুলটিটা।

অজান্তেই ছোট্ট শ্বাস পড়ল আমার। বললাম,—তাহলে জোয়াল ফের তোর কাঁধে চাপল?

—নিতে তো হবেই। পরীর নির্বিকার জবাব,—বড়দা আমার হাত ধরে বলল, ডেলিভারিটা করে নিয়েই সংসারটাকে আবার কড়া হাতে ধর। আমরা কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে গেছি রে!

আশ্চর্য, কোনো হাহাকার নেই, বেদনাবোধ নেই, বোনকে যে ভাইরা স্রেফ ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝে না। এ কি নাড়ির টান? নাকি মেয়েটার মগজ একেবারেই ঘিলুহীন?

একটু বাঁকা সুরেই বললাম,—তা নয় হল। ভাইদের সংসারেই না হয় জীবনপাত করলি। কিন্তু যে-বাচ্চাটা আসছে, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিস? তাকে তো মানুষ করতে হবে। ভাইরা সে-খরচা দেবে?

—ওরা কোথ্থেকে দেবে? তিনটেই তো ভুখ্খা পার্টি।

—তাহলে? তোর বরের কাছে খরচা চাইবি?

—তার আর টিকি দেখা গেলে তো। পরী নড়েচড়ে বসল,—ব্যবস্থা একটা হচ্ছে। চার ভাইবোনে কাল বসেছিলাম। প্রোমোটার ফিট করে বাড়িটা তার হাতে দিয়ে দেব। জমি তো কম নেই, সামনে পেছনের ফাঁকা জায়গা মিলিয়ে প্রায় ছয় কাঠা। আমরা চারজন চারটে ফ্ল্যাট নেব। সঙ্গে ক্যাশ যদি কিছু পাই তো বহুৎ আচ্ছা। মেজদা তো বিয়েশাদি করছে না...ওই চিটিংবাজকে কেই-বা মালা পরাবে...ওর ফ্ল্যাটেই থাকব আমরা দুজনে। আর আমারটায় ভাড়া বসিয়ে দেব। ভাড়ার টাকায় মামা ভাগ্নেকে টেনে দিতে পারব না?

প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ নয়। ঠাট্টার সুরে বললাম,—বাহ্, তুই তো বেশ চালু হয়েছিস!

—হতেই হবে। এখন মা হতে যাচ্ছি না! ছেলেই হোক কী মেয়ে, তাকে মানুষ করার দায়িত্ব তো আমার। বলতে বলতে পরী হাত বোলাচ্ছে পেটে, —আচ্ছা বউদি, ডেলিভারিটা নরমাল হওয়াই তো ভাল, কী বল? সিজার মানেই তো গুচ্ছের টাকার ধাক্কা। ডাক্তাররা চুষে নেবে।

হেসে ফেললাম,—দ্যাখ কী হয়। তার আগে সামনের চারটে মাস তো কাটা।

চার মাস নয়, আড়াই মাসের মাথায় প্রসব করল পরী। মরা বাচ্চা। স্টিলবর্ন। অনেক আগেই পেটে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নড়াচড়া, পরী বুঝতে পারেনি। ভাগ্যিস, সময়মতো ধরেছে ডাক্তার, নইলে প্রাণসংশয় হতো পরীর।

গোলাপির মুখে খবরটা পেয়ে খুব খারাপ লেগেছিল। আহা রে, মেয়েটা কি একটা কিছুও পেতে পারে না? বিধাতা বলে যদি কেউ থেকেও থাকেন, তিনি এত নিষ্ঠুর কেন? নিয়তিদেবী কি চিরকাল মেয়েটাকে নিয়ে শুধু খেলবে?

পরীর হাসপাতাল থেকে ফেরার পর একদিন গেলাম দেখতে। বেশ কাহিল হয়ে গেছে বেচারা। চোখের নিচে কালি, ফ্যাকাশে গাত্রবর্ণ বলে দেয় রক্তাল্পতায় ভুগছে।

আমাকে দেখে শুকনো মুখে হাসল পরী। বলল,—বসো বউদি। আমার তো রোগব্যাধি হয় না, কেউ তাই আমাকে দেখতেও আসে না। তুমি এলে, বড় আনন্দ হল।

পরীর হাতটা ধরলাম। ঠাণ্ডা। নিয়মমাফিক সান্ত্বনার সুরে বললাম,—ভেঙে পড়িস না। যা হল, তা হয়ত তোর মঙ্গলের জন্যেই হল।

—তাই হবে। ব্যাটা জোর বেঁচে গেল। দুনিয়ায় একবার এনট্রি নিয়ে ফেললে কোন চক্করে পড়ত তার ঠিক আছে?

এবারও পরীর স্বর নিতান্ত সহজ। কিন্তু আমার কেন যেন কান্না পাচ্ছিল? দুটো চারটে কথা বলেই উঠে পড়লাম। শুধুই মনে হচ্ছিল, পরী ভেতর থেকে চিড় খেয়ে গেছে, তবু প্রকাশ করছে না।

মাস তিন চার পরীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমি তো জাহাজবাড়ি যাইই না, পরীও আসে না। গোলাপি চ্যানেলের নিউজ, পরী নাকি সুস্থ হয়ে আবার লেগে পড়েছে গৃহকর্মে। রাঁধছে, বাড়ছে, ভাই ভাইদের বউদের সঙ্গে ঝগড়া করছে...। তবে বেরয় না বড় একটা। বাজার টাজারও সম্ভবত ভাইরাই করে। কিংবা তাদের বউরা।

হঠাৎই একদিন ঢাকুরিয়া লেভেল ক্রসিংয়ে পরীর মুখোমুখি। যথারীতি গোড়ালি থেকে এক হাত উঁচুতে শাড়ি, এলোমেলো কুঁচি পেটের কাছে ফুলে আছে, সিঁথিতে ঠাট্টার মতো সিঁদুরের রেখা, হাতে একখানা প্লাস্টিকের থলি। স্বাস্থ্য ফের ফিরেছে পরীর, দিব্যি আবার মুটোতে শুরু করেছে।

চোখ পাকিয়ে বললাম,—একদম আর দেখা নেই কেন? আসিস না যে?

পরীর মুখে অমলিন হাসি,—একটুও সময় পাই না গো, বউদি।

—খালি খেটে মরছিস তো?

—সংসারের চাকা তো চালাতেই হবে গো। ...ছাদে একটা বাগানও করেছি বউদি। সকাল থেকে রাত তার পেছনেই সময় দিতে হয় অনেক।

—হঠাৎ বাগান?

—ইচ্ছে হল। এই তো দ্যাখো, সার কিনে নিয়ে যাচ্ছি। নিমখোল, বোনডাস্ট আছে...। অনেক ফুল ফুটেছে গো। গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া...

—তোর ফুলের শখ আছে জানতাম না তো?

—হয়েছে। ফুল ফুটলে তাকিয়ে থাকতে কী ভাল যে লাগে। আমার হাতেই ফুটল, এতে আর কারুর কোনো হাত নেই, ভাবলেই গায়ে কেমন কাঁটা দেয়। ...এসো না গো, দেখে যাও একদিন।

অস্ফুটে বললাম,—যাব।

পরী চলে যাচ্ছে। দুলে দুলে। ধীর পায়ে।

বড় দ্রুত ঝাপসা হয়ে গেল পরী।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম ভাগলপুরে মামার বাড়িতে ১৯৫০ সনে।

পিত্রালয় বহরমপুর মুর্শিদাবাদে। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে, দক্ষিণ কলকাতায়। কলেজে পড়ার সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর প্রবেশ করেন চাকরি জীবনে। অনেক ধরণের চাকরি করেছেন। এখন সরকারি অফিসার।

সত্তর দশকের শেষ দিকে লেখা শুরু করেন। মেয়েদের নিজস্ব জগতের গল্প তাদের যন্ত্রণা, সমস্যা, আর অস্তিত্বের কথাই লিখতে ভালোবাসেন।

পেয়েছেন একাধিক সাহিত্য পুরস্কার। বর্তমানে বাংলা কথা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকা।

দরবারি কানাড়া সুচিত্রা ভট্টাচার্য